মূর্ত্তিপূজার প্রতি কিরূপে তাঁর বিরাগ উপস্থিত হইল, তাহার বিবরণ তাঁহার জীবনীতে আছে। শৈব-পরিবারে তাঁর জন্ম—শিব-মন্ত্রে দীক্ষা। এক দিন শিবরাত্রির জাগরণে তিনি মন্দিরে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তাঁর পিতা ও আর সকলে ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন—একমাত্র তিনি জাগ্রত রহিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, ইন্দুরেরা মিলিয়া ঠাকুরের উপর মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে—বাদাম মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোগের সামগ্রী যাহা কিছু ছিল—তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ ভোগ চলিতেছে—ঠাকুর না আপনাকে আপনি সামলাইতে পারেন, না তাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারেন। তাঁর সহজে মনে হইল যিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম, তিনি কি সেই জগন্নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর হইতে পারেন? এই ঘটনা থেকে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মিল। এবং ভবিষ্যতে ব্রহ্মনাম প্রচারে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৩। আমাদের অগণ্য দেবদেবীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অতি উচ্চ আসন। পূর্ব্ব-পশ্চিম দক্ষিণ-উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রেই তাঁর পূজা প্রচলিত। আমাদের বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থে কৃষ্ণ-চরিত বর্ণিত আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি—তাঁর সেই জীবনী কি মানুষের আদর্শ-জীবন হইতে পারে, না তাঁর সেই প্রেমলীলা—রাধাকৃষ্ণের প্রেম—গোপিনী-দের সঙ্গে বিহার—প্রেমের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইতে পারে? এই কি স্বর্গীয় প্রেম, না কলুষিত পার্থিব প্রেম? নানা যুক্তি তর্কের সাহায্যে এই প্রেম আধ্যাত্মিক ভাবে কোন কোন গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে বটে—যেমন বৈষ্ণবদের ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে—সে ভাবে গ্রহণ করাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু হায়! কয়জন সে ভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম? সাধারণ লোকের চক্ষে সে প্রেম কিরূপ? ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহাদের কোন কোন নীতি-বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারই উহার পরিচায়ক। প্রধান সাক্ষী গুজরাটের বল্লভাচার্য্য মহারাজ সম্প্রদায়। তাহাদের মধ্যে যে বিষম অনীতি অনাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে, করসনদাস মূলজী নামক গুজরাটের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা জগতের সমক্ষে প্রচার করেন। তাঁহার নামে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বোম্বাই হাই-কোর্টে এক মোকদ্দমা আনেন, তাহাতে মহারাজদের অঘোর-কৃত্য সকল উদ্ঘাটিত হয়। তাহাদের পুরোহিতেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি হইয়া গুজরাটী কুলবালাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করে—সে কাহিনী শুনিয়া সত্য সত্যই অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। বর্ত্তমান বঙ্গ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই।

তাহা ছাড়া—মহাভারতের কৃষ্ণচরিতে কি দেখা যায়? শ্রীকৃষ্ণ একজন বুদ্ধিমান সুচতুর পাণ্ডবনায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির কেবল ধর্ম্মযুদ্ধেরই অনুরাগী। কিন্তু কোন কোন সময়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই পরামর্শে তিনি ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন—সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্র-পন্থা অবলম্বন করেন। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" প্রভৃতি কথা তাহার প্রমাণ।

আমরা সরল সহজ ধর্ম্ম চাই, ধর্ম্মের ভিতরে জটিলতা চাই না। সহজজ্ঞানে যাহা ধর্ম্মের আদর্শের প্রতিকুল, তাহাই ধর্ম্মের জীবন্ত আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। প্রতিমাপূজাকে

অজ্ঞের পক্ষে ব্রহ্মোপাসনার সোপান বলিতে পার, কিন্তু লব্ধ-বিদ্য লোকের জন্য ধর্ম্মের উন্নততম আদর্শ চাই। আমরা স্বয়ংপ্রভ সত্য চাই—স্বয়ংপ্রভ আদর্শ চাই, যাহা নিজে দাঁড়াইবার জন্য প্রক্ষিপ্তবাদ বা টীকা-টীপ্‌পনির অপেক্ষা করে না, কিন্তু যাহা অন্তরের সহিত পূর্ণমাত্রায় সায় পায়, যাহা সহজ অমায়িক অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একান্ত অবিরোধী।

আমরা তবে কোন্‌ দেবতার উপাসনা করিব? সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম—যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর—সকল দেবতার পরম দেবতা—ভূলোকে দ্যুলোকে যাঁর এই মহিমা—এই ধন-ধান্যপূর্ণ শোভা-ময় পৃথিবী যাঁহার রাজ্য—এই প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর যাঁর ঐশ্বর্য্য, যাঁর শাসনে সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে—যাঁর শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র—পক্ষ মাস ঋতু বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, যাঁর শাসনে পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী সকল শ্বেত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। যিনি প্রাণের প্রাণ—যে মহাপ্রাণে এই বিশ্বজগৎ অনুপ্রাণিত—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

আমরা সেই দেবতাকে অর্চ্চনা করি যিনি

সত্যং জ্ঞানমনন্তং।

সকল সত্তার মূল সত্তা—সকল শক্তির মূল শক্তি—চৈতন্যময় আদ্যশক্তি। যিনি সমুদয় বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যাঁর ইচ্ছা সর্ব্বজগতে সমস্ত ঘটনায় দীপ্যমান, যাঁর কর্ম্মের বিরাম নাই, যিনি সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিয়া জীবের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন, "প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন" অবিরত বর্ষণ করিতেছেন, যিনি সেতুস্বরূপ হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—

স সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

আমরা সেই দেবতার পূজা করি যিনি

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং—

একদিকে যেমন পাপের শাস্তা, অন্যদিকে তেমনি পাপীর পরিত্রাতা, একদিকে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, অন্যদিকে অমৃতের সোপান। যিনি আমাদের 'বন্ধু জনিতা বিধাতা।' সুখে দুঃখে মৃত্যুতে সকল সময়ে আমাদের সঙ্গের সঙ্গী। পরিমিত মূর্ত্তির ভিতরে কোথায় তাঁর দর্শন পাইব? পাষাণমূর্ত্তির ভিতরে সেই অনন্তের আভাস কোথায়?

যদি তোমরা ব্রত-পালনে দুর্ব্বলতা অনুভব কর, তবে মহত্তের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া উৎসাহিত হও। সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক ঋষিগণকে স্মরণ কর, বর্ত্তমান সময়ের রামমোহন রায়, দয়ানন্দ স্বরস্বতী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সকল মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর।

দয়ানন্দ স্বরস্বতী বেদকে ধর্ম্মের ভিত্তি করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। বেদের উপদেশ কি?

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে,—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

যিনি আত্মদা বলদা—সমুদয় বিশ্ব যাঁর উপাসনা করিতেছে—সেই এক সৎস্বরূপ, বৈদিক ঋষিদের দেবতা। মহর্ষি উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক রত্ন সংগ্রহ করেন, উপনিষদ কি বলিতেছেন?

নতস্য প্রতিমাঽস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

তাঁহার প্রতিমা নাই মহদ্‌যশ যাঁহার নাম। একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাই উপনিষদের বীজমন্ত্র।

আমরা সেই ধর্ম্ম চাই, যাহাতে বাহ্য-আড়ম্বর নাই, যাহা কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডে পর্য্যবসিত নয়—যাহা অন্তরের ধর্ম্ম—আত্মার

সত্য ক্ষমা দয়া যাহা শিক্ষা দেয়, বিপদে ধৈর্য্য—ধর্ম্মযুদ্ধে বীর্য্য—প্রলোভন অতিক্রম করিতে শক্তি দেয়, যাহা মৃত্যু হইতে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। আমরা সেই ধর্ম্ম চাই, ঈশ্বরের পিতৃভাব—মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব—যার মূলমন্ত্র।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আমাদের জ্ঞানচক্ষে তোমার সত্যের আলোক প্রকাশিত কর। যাহাতে আমরা তোমার সত্য বরণ করিতে পারি, তোমার সত্য ধারণ করিতে পারি, তোমার সত্য অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারি—তোমার সত্য জগতে প্রচার করিতে পারি, এরূপ বল দেও। পরিমিত দেবতার উপাসনাতে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না—তোমার সেই অসীম সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি দেখাও। যাহা কিছু বাহ্য আচার অনুষ্ঠান—কেবল আড়ম্বর মাত্র সার—তাহাতে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের পথ দেখিতে পাই না; তুমি তোমার পুণ্য পথ—তোমার অমৃত পথ প্রদর্শন কর। তোমার অনন্ত আদর্শ—তোমার মহানুভাব সম্মুখে ধারণ কর; তোমার বিরাট-স্বরূপ অন্তরে চিরমুদ্রিত কর। যাহাতে তোমার সহচর অনুচর হইয়া জীবন যাপন করিতে পারি—পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধার মধ্যে তোমার আদিষ্ট ধর্ম্ম পালন কারতে পারি, তোমার গুরুগম্ভীর ভাব জগতে ঘোষণা করিতে পারি, এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

"ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ—দেহ দেহ ও পদ আশ্রয়।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নানা কথা।

চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিগঠন। কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিগঠনের স্থান অতীব উচ্চে। পৌরাণিক দেবতা-কল্পনার ভিতর দিয়া ঐ উভয় বিদ্যা বহুকাল হইতে আপন সজীবতা নানাবিধ রাজবিপ্লবের ভিতরে অদ্যাপিও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপের শিল্পিগণ মৃণ্ময় দেবতা মূর্ত্তি নির্ম্মাণে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেয়। নিরক্ষর হইলেও বংশপরম্পরা ক্রমে তাঁহাদের এই বিদ্যা কিছুমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। লক্ষ্ণৌ ও চুনার অঞ্চলে খেলেনা ও ক্ষুদ্র মনুষ্যাদি মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে তদ্দেশীয়গণ বিলক্ষণ নিপুণতা প্রদর্শন করে। চিত্রাঙ্কনে দিল্লী লক্ষ্ণৌ ও কাংরা উপত্যকার চিত্রকরেরা কি বর্ণবিন্যাসে কি কোমল-ভাবের বিকাশে কি মূর্ত্তির নৈসর্গিক-ভাব ফুটাইয়া তুলিতে, যে ক্ষমতার নিদর্শন দেয়, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। লাহোর মিউসিয়মে কলিকাতা আর্ট-স্কুলে এবং জয়পুর মহারাজার প্রাসাদে এবম্বিধ অনেকগুলি চিত্র সংগৃহীত আছে।

মোগলগণ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পরে বাদসাহগণ পারস্যের অনুরূপ অলঙ্কৃত অক্ষর প্রচলন করিবার জন্য এদেশে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং পারস্যের হস্তলিখিত কোরাণের আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ মনুষ্য-চিত্রাঙ্কনের বিরোধী হইলেও বাদসাহগণের মধ্যে অনেকেই অলঙ্কৃত ফার্শি অক্ষর-লিখনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উদার-হৃদয় বাদসাহ আকবর বলিতেন, "অনেকে মনুষ্যচিত্রাঙ্কনের বিরোধী হইলেও আমি উহার বিরোধী নহি। যাহারা চিত্রকর, তাহারা ঈশ্বরকে বিশেষ ভাবে সন্দর্শন করে; কেন না তাহারা ঠিকই বুঝিতে পারে, যে মূর্ত্তির হস্তপদাদি অঙ্কন সকলই তাহাদের সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু অঙ্কিত মূর্ত্তিতে প্রাণদান, একেবারেই তাহাদের সাধ্যের বহির্ভূত। সে সাধ্য কেবল এক ভগবানেরই আছে।"

দিল্লী বা লক্ষ্ণৌএর চিত্রকরেরা কাগজের উপর চিত্র অঙ্কিত করে, কখন বা হস্তিদন্তের উপর চিত্র ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু কাংরা উপত্যকার চিত্রকরের চিত্রে দেখা যায়, যে স্বর্ণকারগণ অলঙ্কার গড়িতেছে, বণিকেরা উষ্ট্র লইয়া চলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ জানালার অন্তরাল দিয়া রন্ধনরত রাধিকাকে দেখিতেছেন। তাহারা প্রত্যেক সামান্য অতিক্ষুদ্র বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ চিত্র অঙ্কন করে, তাহাতে তাহাদের অঙ্কিতচিত্রে উচ্চ অঙ্গের কলা-বিদ্যার আভাস মিলে। সময়ে সময়ে তাহাদের অঙ্কিত পত্র-পুষ্পের সুন্দর বর্ণচ্ছটা, বিখ্যাত চিত্রকর

রস্‌কিনের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। পর্ব্বত-নন্দিনী পার্ব্বতী, শিব-গঙ্গা-গণেশ, কুসুমিত-কাননবিহারী মহাদেব এ সকল ছবির ভিতরে তাহারা কল্পনাশক্তির সুন্দর পরিচয় দেয়। দাক্ষিণাত্যে দেবমন্দির-গাত্রে, অজন্তের ও সিংহলের পর্ব্বতখোদিত গুহার ভিতরে যে সকল চিত্র অদ্যাপিও বিরাজমান, তাহা রুচিবিরুদ্ধ হইলেও কোন কোনটি বিশেষ নিপুণতার পরিচায়ক।

বিগত অগষ্ট মাসের Modern Review নামক মাসিক পত্রে কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমার স্বামী ডি, এস, সি, উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করিয়া বিলাত হইতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা লাহোর বোম্বাই জয়পুর ও সিংহলে যে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ঐরূপ ভাবে শিক্ষিত চিত্রকর রাবিবর্ম্মার সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে তাঁহার চিত্র সকল উল্লেখ-যোগ্য হইলেও, উহাতে উচ্চ অঙ্গের কল্পনাশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্যমূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তি এতদুভয়ের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহার অনটন তাঁহার চিত্রে অনুভূত হয়। কলিকাতা আর্ট-স্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরকে তিনি ভারত চিত্রকরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে প্রস্তুত। অবনীন্দ্র বাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র। অবনীন্দ্রবাবু মেঘদূত হইতে "নির্ব্বাসিত যক্ষের" "বিমান বিহারি সিদ্ধগণের" ও "সাজাহানের অন্তিম দশার" যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় বিশেষত্ব, কল্পনার মৌলিকতা, ভাবের উচ্ছ্বাস ও চিত্রের সজীবতা, তাহার মতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। ভারতে না হইলেও ইংলণ্ডের কলাবিদগণের নিকট অবনীন্দ্র বাবুর চিত্রগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

এইত গেল চিত্রাঙ্কনের কথা। বৌদ্ধযুগে সিংহলে গয়ায় সারনাথে যাবাদ্বীপেও শ্যামদেশে (যেখানকার শিল্প ভারতীয় বলিতে হইবে) মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ বিদ্যা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঐ সকল মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দর্শককে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। দক্ষিণ ভারতের পিত্তল-মূর্ত্তিতে সুঠাম ও সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হয়। মান্দ্রাজ মিউজিয়মে রক্ষিত নটরাজ শিবের মূর্ত্তিতে ভারতীয় নৃত্যভঙ্গের ছন্দ সুস্পষ্ট ও সুরক্ষিত বলিয়া মনে হয় এবং বুদ্ধ-দেবের কঠিন প্রস্তর-মূর্ত্তি শান্ত ও কোমল-ভাবেরই সাক্ষী দেয়। প্রাচীন হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির প্রায়ই সন্ধান [illegible]; দিল্লী প্রদর্শনীর সময় উড়িষ্যা হইতে [illegible] প্রেরিত হইয়াছিল।

[illegible] ।

কালে নেপালে ধাতু-নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য ও ভাবের বিশেষ পরিচায়ক।

সৌন্দর্য্য তত্ত্ব।—জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই চিত্তকে আকৃষ্ট করে। কল্পনায় যাহা কিছু সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তাহাই ভগবান; তাই তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। অনেকের মতে পৌরাণিক সময়ে পুরাণকারগণের হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি কল্পনায় এই কথাই বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। তাই দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি কল্পনায় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা পড়িয়াছিল। তাই তাঁহারা কৃষ্ণের বিমোহন মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে কালক্রমে ঐ সকল বিমোহন মূর্ত্তিই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিল। অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসক আমরা। আমরাও বলি, সকল সৌন্দর্য্যের আকর তিনি। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য মনুষ্য সৌন্দর্য্যের বা সৌন্দর্য্য-স্নাত পরিপুষ্ট যৌবনের অনুরূপ নহে। তাঁহার আকর্ষণের ভিতরে রূপজ-মোহ নাই, ইন্দ্রিয়ের গন্ধ নাই; তাঁহার সৌন্দর্য্য আমাদিগকে যুগপৎ আকর্ষণ করে—স্তম্ভিত করে। মোহন ও গম্ভীর তাঁহার ভাব। তাঁহার স্বরূপে ভীম ও কান্ত ভাবের অলৌকিক সমাবেশ। হায়! কয়জন লোক তাঁহার সেই অতুলন স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে। প্রেমে আকুল হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হই, আবার তাঁহার মহান গম্ভীর ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে পিছাইয়া পড়ি। গীতাকার একাদশ অধ্যায়ে তাহাই বলিয়াছেন—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। ৪৫ শ্লোক

অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার মূর্ত্তি, তাহা দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, অথচ ভয়ে আমার মন আচ্ছন্ন হইতেছে। অতএব কৃপা করিয়া তোমার প্রসন্ন রূপ দেখাও।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুবাদ।—বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সুবোধ পত্রিকায়, মূল ও তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম তদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বক্তৃতা (খুত্‌বা)।—প্রতি শুক্রবার ও মুসলমানদিগের দুই একটি পর্ব্বদিনে, মধ্যাহ্ন কালের নমাজের অন্তে, খাতিব অর্থাৎ বক্তা পুলপিট হইতে আরব্য ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার ভিতরে মহম্মদ এবং রাজার জন্য প্রার্থনা থাকে। বৎসরের ভিতরে প্রতি শুক্রবারের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থনা, নানা বিখ্যাত বক্তা কর্ত্তৃক রচিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মহম্মদ বলিতেন "বক্তৃতা যত সংক্ষেপ হয়,

ততই ফলপ্রদ। ব্যক্তিগত প্রার্থনা দীর্ঘ হওয়া চাই, কিন্তু নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির পরিচায়ক"। নিজের জন্য সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রার্থনা কর; কিন্তু বক্তৃতা দীর্ঘ হইতে দিও না।" কানপুরের আবদর রহমণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বক্তৃতামালা হইতে তৃতীয় বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "দয়াময় ঈশ্বরের নামে। ঈশ্বরের নাম প্রশংসিত হউক। যিনি আমাদিগকে এই ধর্ম্মের পথ দেখাইলেন, তাঁহাতে সকল প্রশংসা। তিনি যদি পথ না দেখাইতেন, আমরা পথ খুঁজিয়া পাইতাম না। আমি সাক্ষী, যে তিনি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। তিনি এক, কেহ তাঁহার সঙ্গী নাই; আমি তার সাক্ষী। মহম্মদ সত্যবক্তা, ঈশ্বরের ভৃত্য—তাঁহার প্রবক্তা। ঈশ্বর মহম্মদের প্রতি, তাঁহার বংশীয়গণের প্রতি, তাঁহার অনুচরগণের প্রতি, দয়াকরুন —শান্তিবিধান করুন। মনুষ্যগণ! ঈশ্বরকে ভয় কর, বিচার দিনকে ভয় কর, সে দিনে পিতা পুত্রের পুত্র পিতার সাপক্ষতা করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ কর। বর্ত্তমান জীবনে অহঙ্কারী হইও না। বিপথে নীত হইও না। বিশ্বাসিগণ! নমুধার (ব্যক্তিবিশেষ, কাহারও মতে অনুতাপীর) ন্যায় ঈশ্বরের দিকে আইস। তিনি পাপ ক্ষমা করেন, তিনি দয়ালু পাপত্রাতা। তিনি দয়ালু কৃপালু, তিনি রাজা, তিনি পবিত্র, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাময়।"

এই বলিয়া তিনি বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া নীরবে নিজে প্রার্থনা করিয়া পুনরায় মঞ্চে উঠিয়া বলেন "কৃপালু ঈশ্বরের নামে, তিনিই ধন্য। আমরা তাঁহার প্রশংসা করি তাঁহার নিকট সাহায্য চাই, পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁহাতে বিশ্বাস করি। মন্দবাসনা এবং কৃতপাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাঁহার আশ্রয় অন্বেষণ করি। ঈশ্বর যাহার পথপ্রদর্শক, তাহার বিনাশ নাই; তিনি যাহাকে বিপথে লইয়া যান, কে তাহাকে সুপথে আনিতে পারে। তিনি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। তিনি এক, কেহ তাঁহার সাথী নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের সেবক ও প্রবক্তা, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া করুন। মহম্মদ অন্যান্য সকলের অপেক্ষা উচ্চ। ঈশ্বর মহম্মদের বংশীয়গণের ও অনুচরের প্রতি দয়া করুন—তাহাদিগকে শান্তি দিন। আবু বেকার সাদিক, মিতাচারী ওমার ইবন খাতাব, বিশ্বাসী ওথমান, বীর আবু তালেব, আত্মত্যাগী হাসেন হোসেন, উঁহাদের মাতা গরীয়সী ফতেমা, হামজা, আব্বাস ও অন্যান্য অনুচরের প্রতি শান্তি-বিধান করুন। হে করুণাময় পরমেশ্বর! মুসলমান বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা কর। তুমিই আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া থাক। যাহারা মুসলমানধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করে, তুমি তাহাদের সহায় হও। তাহাদিগকে দুর্ব্বল কর—যাহারা মুসলমানধর্ম্মকে হীনবল করিতে চায়। রাজাকে আশীর্ব্বাদ কর, তিনি যেন প্রজাদিগের প্রতি দয়ালু ও অনুকুল হন। ঈশ্বরের সেবকগণ! ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কৃপা করুন। ঈশ্বরের আদেশে সকলের প্রতি সুবিচার কর, সৎকর্ম্ম কর, আত্মীয়গণের ভিতরে দান কর। অপকর্ম্ম অনিষ্ট ও অত্যাচার করিতে, ঈশ্বর নিষেধ করিতেছেন। তিনি সাবধান করিয়া দিতেছেন, সমনস্ক হও। হে মনুষ্যগণ। মহান ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদের প্রার্থনায় উত্তর দিবেন। স্মরণে রাখ, তিনি মহান, মঙ্গলময়, পুণ্যময়, শক্তিময় গৌরবময়।"

তুরস্ক ও মিসরে (খাতিব) বক্তা কাষ্ঠময় তরবারি হস্তে লইয়া বক্তৃতা করেন। রাজ্যের রাজা মুসলমান হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়—

"হে ঈশ্বর! মুসলমান ধর্ম্মের সহায় হও, ইহার স্তম্ভকে সুদৃঢ় কর, অবিশ্বাসকে প্রকম্পিত কর, অবিশ্বাসের সামর্থ্যকে বিনাশ কর। তোমার ভৃত্য—তোমার ভৃত্যের পুত্র—যিনি তোমার বিক্রম ও গৌরবের নিকট অবনত —তুমি যাহার সহায়—আমাদের রাজা আমির সের আলিখাঁ—যিনি আমির দোস্তমহম্মদখাঁর পুত্র, তাঁহাকে রক্ষা কর, তাঁহার রাজত্বকালকে প্রবর্দ্ধিত কর; তাঁহার ও তাঁহার সৈন্য-সামন্তের সহায় হও। হে ধর্ম্মরাজ, পৃথিবীর অধীশ্বর ভগবান্! মুসলমান সৈন্যদিগের সহায় হও; যাহারা অবিশ্বাসী ও বহুঈশ্বরবাদী, যাহারা তোমার শত্রু, তোমার ধর্ম্মের শত্রু, তাহাদের সৈন্যগণকে বিচ্ছিন্ন কর।" *

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে ধর্ম্ম বিষয়ে নিষ্ঠা, মহম্মদের উপর অকৃত্রিম অনুরাগ, এক ঈশ্বরে গভীরতম বিশ্বাস, ধর্ম্মানুষ্ঠানে সারল্য ও আড়ম্বর-শূন্যতা মুসলমান ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

---

* "Notes on Muhamm lanism" by Rev. Hughes, missionary to th Afgans.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪০৬॥৪
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৯৮॥/৩
সমষ্টি	...	৩২০৫ /৭
ব্যয়	...	৫০১॥ ৭
স্থিত	...	২৭০৩॥/০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩০৩॥/০

২৭০৩॥/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২৫১ ৵৪

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

কোম্পানীর কাগজের সুদ

৫১৵৪

২৫১৵৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৸০
পুস্তকালয়	...	৯।০
যন্ত্রালয়	...	১২০।৵০
গচ্ছিত	...	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৭॥০
সমষ্টি	...	৪০৬॥ ৪

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১২॥ ১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪/৯
পুস্তকালয়	...	১।০
যন্ত্রালয়	...	১৩৫৸৬
গচ্ছিত	...	৮০৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১।/৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৬॥/০
সমষ্টি	...	৫০১॥ ৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

১৮২৯ শকের বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়	কলিকাতা	৪৲
শ্রীযুক্ত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	কাশিমবাজার	১২।৵০
" বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	জীবনপুর	৩।৵০
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	বালীগঞ্জ	৩৲
" " সতীশচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
" " গোরীশঙ্কর রায়	কটক	৩।৵০
" " প্রসাদদাস মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
" " বেহারীলাল মল্লিক	ঐ	৩৲
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৩৲
" " দেবেন্দ্রনাথ রায়	ঐ	১৲
" " কেদারনাথ রায়	ঐ	৩৲
" " রামচন্দ্র মিত্র	ঐ	৩৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	সৈয়াদাবাদ	১০৲
" " চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩।৵০
" " হরিশ্চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
" " মনোহর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	১৩৸৵০
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	দেবানন্দপুর	১০৵০
শ্রীযুক্ত বাবু কির্ত্তীবাস সরকার	ক্ষিরপাই	৫৲
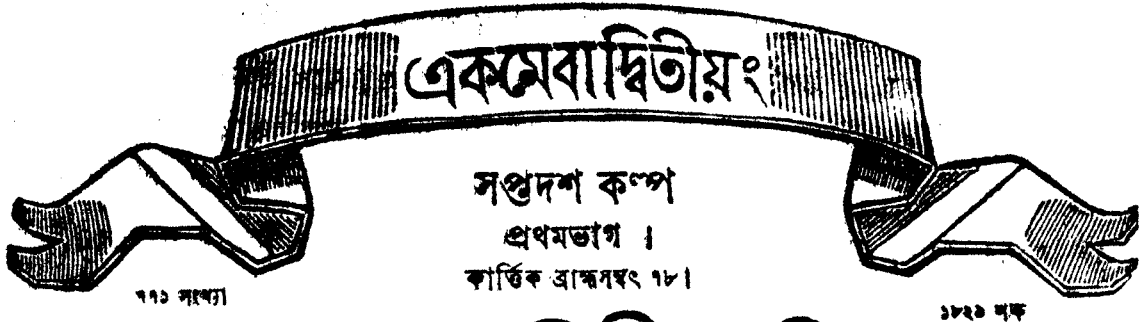
সপ্তদশ কল্প
প্রথমভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।
৭৭১ সংখ্যা
১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ।

গত বারে পৌত্তলিক অপৌত্তলিক উপাসনায় পরস্পর তুলনা করিয়া বলিয়াছি কেন আমরা অপৌত্তলিক উপাসনার পক্ষপাতী। আমার ত মনে হয় না তাহাতে এমন কিছু বলিয়াছি যাহাতে কাহারও মনে আঘাত লাগিতে পারে। প্রচলিত পৌত্তলিক উপাসনায় ধর্ম্মের আদর্শ যে উন্নত নয়, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল। যার যে ধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস,সেই ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া ভক্তের মনে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অন্যায়, এ কে না স্বীকার করিবে? আমার যাহাতে বিশ্বাস তাহাই সত্য, আর তার বিপরীত যাহা কিছু সকলি অসত্য, একেই বলে গোঁড়ামি, এরূপ অনুদারতা মনে স্থান দেওয়া অনুচিত। যেখানে আন্তরিক বিশ্বাস—আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখা যায়, তা অপাত্রে পড়িলেও তাহাতে দোষ ধরা যায় না; যদিও ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করিবার ইচ্ছা মনে প্রবল হইতে পারে। কিন্তু যেখানে মনে এক মুখে আর,অন্তরে বাহিরে মিল নাই, লোক দেখাইবার জন্য কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান, যাহাদের আচার এইরূপ তাহাদের আচরণ অবশ্য নিন্দনীয়।

বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিতে গেলে আমরা যে ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিয়াছি, তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। আমাদের শাস্ত্রে অধিকার ভেদের কথা আছে। মূর্ত্তিপূজার বিধান অনধিকারির পক্ষে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাঁহারা আরো উচ্চ-পদবীতে উঠিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ব্রহ্মোপাসনাই প্রশস্ত। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তোমরাও যদি মূর্ত্তিপূজাকে ব্রহ্মপূজার সোপান মনে কর, তবে সেই অধঃস্তরেই চিরজীবন পড়িয়া থাকা ঠিক হয় না। ক্রমে সেই সোপান অতিক্রম করিয়া যাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে পার, তাহার উপায় দেখ—সেইরূপ সাধনা অভ্যাস কর। সাধনা বলে যে নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন লাভ করা যায়, সাধু-ভক্তের জীবনে আমরা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাই। আপনারাও উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সৎকার্য্যে রত থাক,বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মধ্যান—

পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন হও—এই সকল উপায়েই ব্রহ্ম দর্শন লাভ হয়। উপনিষদে আছে—

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং
পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

এই বচনে জ্ঞান, চিত্তশুদ্ধি ও ধ্যান এই ত্রিবিধ মার্গ সূচিত হইতেছে। যখন জ্ঞান দ্বারা জানিলাম—ব্রহ্ম যিনি তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং—একমেবাদ্বিতীয়ং"—যখন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইল—তখনই ধ্যানযোগে সেই নিরবয়ব নিরঞ্জন ব্রহ্মের দর্শন সুলভ হইল। এইরূপ সাধনার অভ্যাস করা চাই—চিরদিনই যদি আমরা নিকৃষ্ট পন্থা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির আশা কোথায়?

যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইয়াছেন—যাঁহারা জানিয়াছেন যে 'পরাবিদ্যা' সেই, যদ্দ্বারা অবিনাশী সত্যস্বরূপকে জানা যায় আর যাঁহারা সেই পন্থা অন্বেষণ করিতেছেন যাহা মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাঁহাদের আমি দু-চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভ্রাতৃগণ! ভগিনীগণ! তোমরা জানিয়াছ—ঈশ্বর সসীম নন—তিনি অনন্ত—দেশেতে অনন্ত কালেতে অনন্ত। তিনি অসীম আকাশে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। উপাসনার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। তিনি যেমন দূর দূরস্থিত আকাশে, তেমনি এখানেই বর্ত্তমান—এখানে থাকিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তিনি যেমন সকল জগতের অধীশ্বর, তেমনি আমারও ঈশ্বর। ক্ষুদ্র কীট যে আমি, তিনি আমাকেও বিস্মৃত নহেন। তিনি আমারও পিতা—আমাকেও প্রীতি করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিধান করিয়া আমাকেও আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। 'স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।' উপনিষদের এই মহা বাক্য আমরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখি। এই কথা গুলি শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেই হইল, তা নয়, হৃদয়ে অনুবিদ্ধ করিতে হইবে। তা হ'লেই দুঃখ শোকে সান্ত্বনা পাইবে, সকল ঘটনাতেই শান্তি ও আরাম পাইবে। উপাসনার অগ্রে ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস করিবে—ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রহ্মোপাসনা হয় না। যেমন কোন মূর্ত্তিপূজক তাঁর মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া পূজা করে, তেমনি আমরা যদি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতারূপে আরাধনা করিতে পারি, তা হ'লেই সে উপাসনা সার্থক হয়; মৌখিক উপাসনায় কোন ফল নাই।

আর একটি কথা। শুধু উপাসনার সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম, তাঁর নাম উচ্চারণ করিলাম, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল তা' মনে করিও না। গৃহকার্য্যে কর্ম্মক্ষেত্রে—সকল সময়ে তাঁকে মনে রাখিতে হইবে—সেই হচ্ছে ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি? না যদ্‌যদ্‌কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যে কোন কর্ম্ম করিবে তাহা ব্রহ্মেতেই সমর্পণ করিবে। আমি ধনের জন্য, মানের জন্য, নামের জন্য, লোকের মনোরঞ্জনের জন্য, অন্যের উপর জয়লাভের জন্য কর্ম্ম করি—এ ত অনেকেই করে—এতে আমার পৌরুষ কি—আমার মনুষ্যত্ব কোথায়? ঈশ্বর-উদ্দেশে কর্ত্তব্যসাধনেই আমাদের মনুষ্যত্ব। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরের ধ্যানধারণা করিবে, তাহা নহে; কিন্তু গৃহে থাকিয়াই ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্ম আমাদের লক্ষ্য—কাজকর্ম্মে আমরা যতই ব্যস্ত থাকি, আমরা যেন কখন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা জীবনতরী পরিচালিত করিব। সেই কর্ণধার

হাল ধরিয়া থাকিলে আমরা সমুদয় বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আমাদের গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারিব।

ব্রহ্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে রোগে শোকে—নির্জ্জনে সজনে, কর্ম্মক্ষেত্রে বিষয়-কোলাহলের মধ্যে সকল সময়, সকল অবস্থাতে, সকল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অন্তরে অনুভব করা—ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। এই ব্রহ্মনিষ্ঠার ফল কি? না অভয় প্রাপ্তি।

যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে; অথ সোঽভয়ংগতোভবতি।

সাধক যখন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম কিরূপ? না—"অদৃশ্যে অনাত্ম্যে" অদৃশ্য অশরীরী—তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন—অনিরুক্তে—বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। "অনিলয়নে"—নিরাধার অথচ সর্ব্ব মূলাধার—এই যে ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি ভয়শূন্য হন। এই ভয়াবহ সংসারে নির্ভয় হওয়া কিছু সামান্য কথা নয়। দেখ এখানে কত প্রকার বিভীষিকা চারিদিকে রহিয়াছে—রোগের ভয়—বিপদের ভয়—প্রিয়জন বিচ্ছেদের ভয়—পাপের ভয়—লোকের ভয়—রাজার ভয়—মৃত্যুর ভয়—এই সকল ভয়ের মধ্যে যাহাতে অভয় পাওয়া যায় যদি এমন কোন ঔষধ থাকে, তবে কি তাহা মহৌষধ নহে?

দেখ আমরা লোকভয়ে কি না করি? যাহা অকর্ম্ম তাহা করিতে উদ্যত হই—যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে ভয় পাই। কত সময় সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি—যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা গ্রহণ করিতে ভীত হই—যাহা সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা পালন করিতে ভীত হই। কিন্তু কি ভয় লোকভয়ে? যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহার কি ভয়? বিশ্বপতি রাজরাজেশ্বর যাঁর আশ্রয় তাঁহার কি ভয়? পৃথিবীর ইতিহাসে—ভারতের ইতিহাসে আমরা কত কত সাধু সজ্জনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাঁহারা সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন—প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদের বল সাহস ধৈর্য্য উৎসাহ দেখিয়া আমরা অবাক হই—তাঁহাদের প্রবর্ত্তক কে? কে তাঁদের নায়ক—সেই মহাশক্তিধারী পরমেশ্বর। যাঁর বলে বলীয়ান হইয়া আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার?"

শিখ-ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে পাই? শিখেরা অল্প সময়ের মধ্যে দেখ কিরূপ মহত্ত্ব-শিখরে আরোহণ করিল! শিখদের দ্বাদশ গুরু—গুরু নানক প্রথম, আর গুরু গোবিন্দ শেষ গুরু। নানকের সময় শিখেরা এক ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায় মাত্র ছিল; ক্রমে যেমন তাহাদের জাতীয় জীবন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; মোগলদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মোগলদের তখন বিরাট রাজ্য—প্রভূত বল—অতুল ঐশ্বর্য্য—সুশিক্ষিত সৈন্যসামন্তের অভাব নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র শিখসম্প্রদায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কখন জয় কখন পরাজয়—এই উত্থান পতনের মধ্য হইতে তাহারা অচিরাৎ এক প্রবল জাতির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিল। তাদের নিয়ামক কে? সেই অলখ নিরঞ্জন বিশ্বেশ্বর, যিনি মৃত্যুর মধ্য হইতেও অমৃত বর্ষণ করেন—অলখ নিরঞ্জন!

মহারব উঠে, বন্ধন টুটে, করে ভয় ভঞ্জন।

সে সময়ে যে বিষমকাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছিল, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কি রে ?
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ, পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে
বীরগণ জননিরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরাল
পঞ্চনদীর তীরে।

যখন আমরা ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হই—যখন ধর্ম্মের অনল আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয়—তখন আমাদের কি ভয় ? সাধু যার ইচ্ছা, সাধু যার চেষ্টা, ঈশ্বর তাহার সহায়। কোন পার্থিব শক্তি তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। রাজা তোমাকে কারা-রুদ্ধই করুক, দেশান্তরে নির্ব্বাসিতই করুক, তোমার আত্মশক্তি অপরাজিত। তোমার অন্তরের আলো নির্ব্বাণ হইবার নহে। বন্ধুগণ শ্রবণ কর, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের অন্তরে অভয়-বাণী দিতেছেন। সেই অভয়দাতা বিধাতা পুরুষ—

যিনি নানা কণ্ঠে ক'ন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্ম্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার ?
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল' তোল' শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির!

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। সত্য অর্থাৎ সত্তা,—তিনি আছেন, কোথায় আছেন ? সর্ব্বত্র—এই মন্দিরে—হৃদয় মন্দিরে, সএবাধস্তাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। তিনি—সর্ব্বকালে বিদ্যমান, এক সময় ছিলেন না—এক সময়ে থাকিবেন না—তাহা নয়, সর্ব্বকালে বিদ্যমান তিনি,—সএ-বাস্থ সউর্দ্ধঃ।

সত্যং—সত্য যে বস্তু তা জড় নাহে, জ্ঞান—আমরা যখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞাতসারে কার্য্য করি, তখন জানিতে পারি—আমি জ্ঞান। কিন্তু আমি অপূর্ণ জ্ঞান—কতক জানি, কতক জানি না। সত্য যিনি, তিনি পূর্ণ-জ্ঞান। আমি শক্তিতে অপূর্ণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁর ইচ্ছায় বিশ্ব-সংসার বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; তাঁর অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে সমুদয় জগৎ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—সে ইচ্ছার বিরাম হইলে পৃথিবী প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয়।

সত্য যে বস্তু তা আশ্রিত ও পরতন্ত্র নহে—কাহারো ইচ্ছার অধীন নহে—তার কোন অভাব নাই—অতএব পরিপূর্ণ ঈশ্বরই সত্য।

সেই চৈতন্যময় অমৃতপুরুষ, সকল সত্তার সত্তা—সর্ব্বমূলাধার যে পরমেশ্বর, তিনি আমাদের উপাস্য দেবতা। উপাসনার সময় যদি তাঁর সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহলেই উপাসনা সার্থক হয়। ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রহ্মোপাসনা হয় না। মূর্ত্তি-পূজক যেমন মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া পূজা করে, ব্রহ্মকে সেইরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার অর্চনা করিতে হইবে। কিন্তু উপাসনা সাধনা মাত্র—এই সাধনার সিদ্ধি হয়—জীবনে। জীবনের সকল কার্য্যে, সকল ঘটনা সকল অবস্থাতে, যদি সেই সত্যের সত্তা অনুভব করতে পারি, তা হলেই আমাদের জীবন-তরি সরল পথে চলিয়া আমাদিগকে গম্য স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত করে।

সংসারে নানা বিঘ্নবিপত্তি বিভীষিকা প্রলোভন—পাপের প্রলোভন,মৃত্যুর বিভীষিকা। এই ভবসাগরের যে দুই কূল আমরা তার মধ্য দিয়া চলিয়াছি; একদিকে আলো একদিকে অন্ধকার, আরোগিতা রোগ, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, হর্ষ শোক, মিলন বিচ্ছেদ, জীবন মৃত্যু। জীবনমৃত্যুর মধ্যে যে দুদিন এখানে কাটাইতে হইবে তা কিরূপে যাপন করিব ?

শ্রেয় প্রেয় এই দুইপথ—এক দিক দিয়া স্বার্থ-সাধন—অন্য দিকে পরসেবা। প্রেয় বলে—

হেসে খেলে নেওরে ভাই মনের সুখে।

ইহা অপেক্ষা অদূরদর্শিতা আর কি হইতে পারে ?

প্রেয়ের মন্ত্রণা এই যে,—ধনের জন্য,মানের জন্য—গৌরবের জন্য, শত্রুর উপর জয়লাভের জন্য যে কোন উপায়ে চেষ্টা কর। পরে এই প্রশ্ন আসে—ততঃ কিং। এ সব তোমার কারায়ত্ত হইল. তাতেই বা কি ? শ্রেয় বলে—ঈশ্বরের উদ্দেশে পরসেবা কর। আত্মসংযম অভ্যাস কর—আপনার উপর জয়লাভ কর, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের মঙ্গল সাধন কর, ঈশ্বরের জন্য বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন কর। ঈশ্বর আমারদিগকে নানা উপায়ে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন—বিপদ প্রেরণ করিয়া—শোকে নিমগ্ন করিয়া, বলিতেছেন আমার কাছে এস—আমি তোমাকে প্রকৃত শান্তি দিব। যাহারা আত্মসুখে রত, তাহাদের কাছে সংসার প্রহেলিকা মাত্র। যখন শ্রেয়কে অবলম্বন করি,তখন সে প্রহেলিকার অর্থ পাই।

তখন বল পাই—শান্তি ও অভয় পাই—মৃত্যুও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না।

হে মূঢ় মানব—কেন শোকে মুহ্যমান, জর্জর বিষাদে; "যাঁর প্রীতি সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে—তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা"।

জানো সনোবন্ধুর্জনিতা সবিধাতা। সেই মঙ্গলস্বরূপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন কর, কোন ভয় নাই। হে ভ্রাতৃগণ! হে ভগিনীগণ! আমাদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে ? যখন আমরা জানিয়াছি যে আমাদের পূজার যিনি দেবতা, তিনি মঙ্গলময় পরম দেবতা; আমরা যেখানে যাই তাঁরই মঙ্গলরাজ্যে বাস করিব, চিরকাল তাঁর আশ্রয়ে থাকিব; তখন কিসের ভয় ? সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না। মৃত্যুতে যখন বিনাশ ও দুর্গতির আশঙ্কা থাকে, তখনই বাস্তবিক তাহা ভয়ের জিনিস হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যখন দেখি যে মৃত্যুই সেই অমৃতের সোপান, তখন আর কি ভয় ? যদিও সেই মৃত্যুর পরপার হইতে কেহ কখন ফিরিয়া আসিয়া আমারদিগকে কোন কথা বলে নাই, তথাপি ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে অভয় বচন দিতেছেন, যে আমার শরণাপন্ন হও—কোন ভয় নাই।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচঃ।
তেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর লহ এক আমারি শরণ।
হরিব সকল পাপভার করিও না শোক অকারণ।

ধর্ম্মজীবন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, যে ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—উপাসনার এই দুই অঙ্গ। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। আমাদের ব্রত সন্ন্যাস নয়। অরণ্যে গিয়া ঋষিরা যেমন ব্রহ্মসাধন করিতেন, আমাদের বিধান তাহা নয়। বর্ত্তমান যুগের নববিধান এই, যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে—গৃহস্থাশ্রমে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে

হইবে। একদিকে প্রেমভক্তির উৎকর্ষ চাই, অন্য দিকে কর্ত্তব্যসাধন চাই। এই দুয়ের মিলনে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা হয়।

প্রথম কর্ত্তব্য আপনার প্রতি। শরীর-রক্ষা, আত্মোন্নতি, জ্ঞানার্জ্জন, সংযম, সদভ্যাস, ইহাদের প্রভাবেই চরিত্র গঠিত হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আপনার প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিলে চলিবে না; যেমন আপনার প্রতি, তেমনি অন্যের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে। ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া ভালবাসা স্নেহ-মমতা শ্রদ্ধা-ভক্তি এই সকল ভাবের ক্ষেত্র সমাজ। এক দিকে আত্মসুখ, আর এক দিকে পর-সেবা, এ দুইই চাই। এই দুয়ে অভেদ সম্বন্ধ। এই দুয়ের যখন মিল হয়—ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য যখন রক্ষিত হয়, তখন পরসেবাতেই আত্মতুষ্টি, কর্ত্তব্যসাধনেই আনন্দ। তখন আর কোন ভাবনা থাকে না। কিন্তু কখন কখন এমন সময় আসিয়া পড়ে, যখন আত্মসুখ ও পরসেবা এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন এই উভয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন দেখিতে হইবে, কোন্‌টা শ্রেয় এবং কোন্‌টা প্রেয়। যিনি প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহারই মঙ্গল। যিনি শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। এই দুয়ের সংঘর্ষের সময় শ্রেয়ের উদ্দেশে আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ-সাধন।

প্রীতির স্থান উচ্চতর হইলেও কর্ত্তব্যেরও স্থান আছে। প্রেম রক্তমাংস প্রাণ, কর্ত্তব্য—অস্থি-হাড়। প্রেম বিনা কর্ম্ম কঙ্কালসার, আবার শুধু ভাবের উপর ধর্ম্ম-স্থাপন ভিত্তিহীন। ভাব ক্ষণস্থায়ী। প্রেম ও কর্ম্ম এই দুয়ের যোগে জীবন। ধর্ম্মকে জীবনে আনিতে হইলে এ দুইই চাই। প্রীতির পরিচয় এই কর্ম্মক্ষেত্রে। কিন্তু প্রীতিলাভ আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রীতি থাক্‌ বা না থাক্‌, কর্ম্ম করিতেই হইবে। ঈশ্বরপ্রীতি যদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হয় ত ভালই। কিন্তু প্রীতির অভাবেও জীবন নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে। সমাজে থাকিতে গেলে কর্ম্মসাধন বিনা গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে? গীতার উপদেশ এই যে নিষ্কাম ভাবে ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইবে।

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং।

আমি বলিয়াছি যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন আমাদের ব্রত। কিন্তু ধর্ম্ম কি? কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ। বৈদিক কালে যখন হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন জ্ঞানবাদী ঋষিরা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

> অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তংছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সাম অথর্ব্ব বেদ এ সমুদয়ই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আমাদেরও সেই গম্ভীর উক্তির প্রতিধ্বনি করা আবশ্যক। আমাদেরও ঘোষণা করিতে হইবে যে ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু; বাহ্যক্রিয়া ধর্ম্ম নয়। প্রেম-বিশ্বাস, ন্যায়-সত্য মায়া দয়া, এ সকল ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। বাহ্যিক আচার সোপানমাত্র—উহা বহিরাবরণ (খোষা), তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ধর্ম্ম যে পরিমাণে হৃদয়কে উন্নত ও

পবিত্র করিতে পারে, তাহাতেই তাহার বল পরীক্ষা হয়। আমাদের সমাজে যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষেরা উদয় হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু, তাঁহাদের জীবনীতে আমরা কি দেখিতে পাই? সত্য তাঁহাদের ব্রত, ঈশ্বর তাঁহাদের জীবনের ধ্রুবতারা, ব্রহ্মকে তাঁহারা জীবনমিত্র রূপে বরণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহাদের মহত্ত্ব, তাঁহাদের সাধুতা; এবং এই কারণেই তাঁহারা সাধারণের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন। সকলে তাঁহাদের সেই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর; ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হও, কার্য্যে ন্যায়বান হও, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীল হও, নিজে অন্তঃশুদ্ধি লাভে যত্নশীল হও, মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল হইবে।

আপনি ভাল হওয়া—আপনাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ ও উন্নত করা প্রতিজনের প্রধান কর্ত্তব্য। তার পর অপরকে ভাল করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। আপনি ঠিক থাক, সৎকর্ম্মে রত থাক। যদি আপনি ঠিক থাকিতে পার, আপনার চরিত্রের প্রভাবে, নৈতিক বলে অপরকেও ঠিক পথে টানিয়া আনিতে পারিবে। তোমার বাক্যে তোমার কার্য্যে তোমার দৃষ্টান্তে লোকে আকৃষ্ট হইবে। যখন তুমি তোমার চরিত্রের আলোক তুলিয়া ধরিবে, তখন সে উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া যে দুর্ব্বল সে সবল, যে ভীরু সে অভয় হইবে, তোমার বিপন্ন ভ্রাতাগণ ধর্ম্মের পথে,—কল্যাণের পথে উন্নীত হইবে। তুমি আত্মবলে আত্মসাধনগুণে যে আধ্যাত্মিক রত্ন আহরণ করিতেছ তাহা পরসেবায় নিযুক্ত কর। আপনাকে পবিত্র কর, ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন কর, দেখিবে কর্ত্তব্য সকল গঙ্গাস্রোতের ন্যায় সহজে স্যন্দমান হইবে, তাহার কঠোরতা চলিয়া যাইবে, কর্ত্তব্যসাধনে অপার আনন্দ ও উৎসাহসঞ্চার হইবে।

প্রারম্ভে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, যে যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে, তাঁহার আদেশ বলিয়া পালন করিবে। ফলকামনা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে সকলই সমর্পণ করিবে। আত্মসমর্পণই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ সমর্পণ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, যদি তাঁহার হস্তে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের হাল ছাড়িয়া দেই, কদাপি আমাদের বিনাশ নাই। তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থিরভাবে রাখিয়া তাঁহাকে প্রীতি করা, নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন জানিবে।

ঈশ্বর-প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন।

গত কয়েক দিনের উপদেশ শ্রবণে আমাদের বিশেষ রূপে হৃদ্‌গত হইয়াছে যে ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই প্রকৃত উপাসনা। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করা, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ নিবদ্ধ করা, সাধনাপ্রভাবে তাঁহার সমীপস্থ হওয়া এ সকলই নিজ নিজ যত্ন-চেষ্টা ও আয়াস সাপেক্ষ। সম্মুখে পবিত্রতম পরমেশ্বর—আর দীন ভক্ত আমি তাঁহার সম্মুখে যোড়করে দণ্ডায়মান। অপার প্রেমের জলধি সম্মুখে বিস্তারিত, আমি আমার অতি ক্ষুদ্র প্রেমকণা তাঁহাকে উপহার দিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্যাকুল। পাপে তাপে

বিষাদে গ্লানিতে কলঙ্কিত, আমি তাঁহার চরণের পূত-বারিতে আত্মার চিরসঞ্চিত কালিমা ধৌত করিবার জন্য লালায়িত। পৃথিবীর ক্ষুদ্র বিষয়ে—নশ্বর রূপলাবণ্যে প্রীতিস্থাপন করিতে গিয়া প্রতারিত আমি এইক্ষণে তাঁহার অগাধ প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া প্রেমের সার্থকতা সম্পাদনার্থ সমুৎসুক। এইত তাঁহার সহিত প্রীতিস্থাপনের ব্যাকুলতার প্রথম অবস্থা। উচ্চে তিনি রহিয়াছেন, অথচ সূর্য্য চন্দ্র বহু সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও যেমন ক্ষুদ্র পৃথিবীর সমুদ্র-জলকে আকর্ষণ করিয়া প্রতিদিন দুইবার করিয়া জোয়ার ভাঁটার সংঘটন করায়, তেমনি তিনি তাঁহার প্রেমরজ্জু দিয়া মনুষ্য হৃদয়কে নিয়তকাল আকর্ষণ করিতেছেন—তাঁহার পবিত্রস্বরূপে তাঁহার সস্নেহ-উদার-বাহুবেষ্টনের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন। কে তাঁর সে টান বুঝিতে পারে, যে তাঁহাকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিয়াছে। আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতে শিক্ষা করিতেছি বলিয়া, তাঁহার মধুর আহ্বান আমাদের সকলের কর্ণকে স্পর্শ করিতেছে; তাই আমরা বাহিরের কোলাহল হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক্ষণে তাঁহার আশ্রয়ে অপার তৃপ্তি লাভ করিতেছি। তিনি এখানে অজস্রধারে প্রীতি-দান করিতেছেন, তাঁহার ভালবাসা মুক্তহস্তে পরিবেশন করিতেছেন, তাই সম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া নহে—কিন্তু নির্ভয়ে তাঁহাকে বলিতেছি যে তুমি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু, তোমার সঙ্গে যে মৈত্রী তাহা বড়ই মধুর, জগৎ সে প্রেমের তুলনা কোথায় পাইবে।

ঈশ্বরের সহিত প্রীতি বন্ধনে আমি একদিকে, আর একদিকে ভূমা পরমেশ্বর; জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, মধ্যে আর কেহ নাই; বাহিরের বস্তুর ব্যবধান নাই। কিন্তু ঈশ্বরের যে প্রিয় কার্য্য-সাধন, তাহা অপরকে লইয়া জনসমাজকে লইয়া। এই প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রথমতঃ আপনাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, হৃদয়ের ভিতরে যে সকল সাধুভাব আছে,তাহা উদ্দীপ্ত ও জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। এ জীবন যাহা ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা উদ্দাম ভোগ-বিলাসের জন্য নহে, কিন্তু উহা পরের জন্য, এ ভাব নিয়তকাল স্মরণে রাখিতে হইবে। যদি বৈরাগ্য বলিয়া জগতে কোন মূল্যবান পদার্থ থাকে, তবে তাহা সংসারে থাকিয়া পরসেবায় তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে। সমস্ত দিন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করিয়া যে উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছ, তাহাতে কি তোমার সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধ পিতা মাতা, অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ-রক্ষা হইতেছে না; দীনদরিদ্রআতুর অন্ধ-বধিরদৃষ্টিহীন সহায়হীন তোমার দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা লাভে কি দিনাতিপাত করিতেছে না। সংসারি! তোমরা পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখ দেখি, একথা কি সত্য নয়, যে সেই পরমমাতা—বিশ্বগৃহিণী তাঁহার অনন্ত উদার সদাব্রত—অসংখ্য রন্ধন-শালা জগৎময় প্রমুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পুত্র-কন্যা অসংখ্য নরনারীর অন্নপরিবেশন ভার তোমাদের সকলের হস্তে কি অর্পণ করিয়া রাখেন নাই। ত্যাগের ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য অরণ্যে যাইতে চাও, ফিরিয়া আইস! সংসারের ভিতরে ত্যাগের ধর্ম্ম শিক্ষা কর। গঙ্গা নিজে বিশুষ্ক হইবার আশঙ্কা না করিয়া যেমন তাহার উচ্ছ্বসিত সমস্ত বারিরাশি মহাসমুদ্রে দিবারাত্রি

চালিতেছে, তেমনি নিজ পরিবারের উদ্দেশে—আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশে, নিজ গ্রাম ও স্বদেশের উদ্দেশে—সর্ব্বশেষে অপরের উদ্দেশে মুক্তহস্ত হও। অর্থে না পার সামর্থ্য দিয়া, শক্তি না থাকে পরামর্শ দিয়া, কিছুই না থাকে সাধুকার্য্যে উৎসাহ দিয়া, সেবাব্রতে সকলের কল্যাণ সাধন কর। জীবিকার জন্য সমস্তদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে শীর্ণ হইতেছ, মনের শান্তি তিরোহিত হইতেছে, বিষণ্ণ হইও না, সান্ত্বনা লাভ কর। উৎসাহী হও, ধন্য তুমি। বিশ্ব-পরিবেশনের ভার তোমারই হস্তে রহিয়াছে। সাধু সেখ সাদী বলিতেছেন, ধনবান। প্রভূত অর্থ তোমাদের হস্তে রহিয়াছে, ঈশ্বর তোমাকে তোমার সঞ্চিত অর্থের উপর প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখেন নাই; তিনি তোমাকে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের যে অবসর দিয়াছেন দরিদ্রের ভাগ্যে তাহা সম্ভবপর নহে; পরসেবা গ্রহণ কর, মুক্ত হস্ত হও, পর দুঃখ দূর কর, কঙ্কালবশেষ দরিদ্রের জঠর-জ্বালা নির্ব্বাণ কর, শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইয়া দাও। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। শুদ্ধ সংসারীকে কেন, ঈশ্বর সকলকেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের অবসর প্রদান করিয়াছেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী থাকিয়া সংসারের শৃঙ্খলায়, গৃহধর্ম্ম পালনে, রোগীর শুশ্রূষায়, অতিথি-আত্মীয় সেবায় প্রবৃত্ত থাকুন। এইখানেই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। যুবা চরিত্রকে বিমল রাখিয়া জ্ঞান শিক্ষায়, অর্থোপার্জ্জনে, পাত্রবিবেচনায় স্নেহ মমতা শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে কৃতার্থতা লাভ করুন, শরীরকে নিরোগ রাখিতে অভ্যাস করুন। এইখানেই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। বৃদ্ধ-পঙ্গু সদুপদেশদানে তৎপর হউন; এইখানেই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধন। এইরূপে সকলে নিজে উন্নত হও, অপরকে উন্নত কর, স্বদেশ স্বজাতির ও পরের সেবা কর। একভাবে বলিতে গেলে ঈশ্বরকে প্রীতি করা অন্তর্ম্মুখী-সাধন এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করা বহির্ম্মুখী-সাধন। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে এমনই ঘনিষ্ঠতম যোগ, যে ঈশ্বর-প্রীতি সমধিক প্রবর্দ্ধিত না হইলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে না।

দুর্ব্বল আমরা! আইস আমরা সকলে জোড়করে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলি, হে ভগবন্! তোমাকে ভালবাসিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও, তুমি যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এ সত্য আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও। তোমাকে পাইলেই যে আমাদের দেবত্ব—এবং তোমার প্রিয় কার্য্য-সাধনেই যে আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব, এ শিক্ষা আমাদিগকে কৃপা করিয়া প্রদান কর। তোমার নিকট জোড়করে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

জীবাণু-বিদ্যা।

জড় ও জীব বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা লইয়া এ পর্য্যন্ত যতগুলি শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় জীবাণু-তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। অতি অল্পকাল মধ্যে এই শাস্ত্রটি এত অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে, তাহার বিশেষ বিবরণ শুনিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। উদ্ভিদ্‌বেত্তা, রসায়নবিদ্ এবং নিদানতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতই বলিতেছেন, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের সহিত জীবাণু-তত্ত্বের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

এই শিশুবিদ্যার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর সাহেবই (Pasteur) ইহার জন্মদাতা। দুগ্ধে দধি-বীজ দিলে অতি অল্পকাল মধ্যে সমস্ত দুগ্ধ অম্ল-স্বাদযুক্ত হইয়া দধিতে পরিণত হয়; দ্রাক্ষা বা চিনির রসে কিণ্ব (yeast) দিলেও তাহা মদ্যে পরিণত হয়। এই অভিষবণ ব্যাপারকে (Fermentation) প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ কোন প্রকার রাসায়নিক কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাষ্টর সাহেব প্রাচীনদিগের এই ব্যাখ্যানে তুষ্ট না হইয়া, গত শতাব্দীর মধ্যকালে বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জানা গিয়াছিল, অভিষবণ কেবলি রাসায়নিক কার্য্য নয়; এক এক জাতীয় অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জীব দুগ্ধ ও শর্করাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জীবন ধারণের জন্য তাহারা ঐ সকল জিনিস হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, এবং ইহাতেই সেগুলি বিকৃত হইয়া দধি-মদ্যাদিতে পরিণত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে জীবনধারণের জন্য যতটা অক্সিজেন লওয়া আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অক্সিজেন জীবাণুগণ আশ্রিত পদার্থ হইতে বাহির করিয়া ফেলে। আশ্রিত বস্তুকে এই প্রকার অনাবশ্যকরূপে বিশ্লিষ্ট করা জীবাণুগণের একটা প্রধান বিশেষত্ব। এই কার্য্য কিপ্রকারে তাহাদের জীবন ধারণের সহায়তা করে, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। জীবাণুসকল কেবল তাহাদের আশ্রিত পদার্থ হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সাধারণ জীবের ন্যায় উহাদিগকে বায়ু হইতেও কিছু কিছু অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে দেখা গিয়াছে।

শাস্ত্রমাত্রকেই সাধারণতঃ বিশুদ্ধ ও ব্যাবহারিক (pure and mixed) এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। জীবাণু-তত্ত্বকে ঐ দুই শ্রেণীর যে—কোনটিতে ফেলিতে পারা যায়। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান হিসাবে ইহা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার (Botany) অন্তর্গত।

ব্যাবহারিক শাস্ত্র হিসাবে দেখিলে ইহাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও নানা প্রকার শিল্পবাণিজ্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, যক্ষ্মা, প্লেগ্ ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া পূর্ব্বোক্ত জীবাণু দ্বারাই প্রাণি-শরীরে উৎপন্ন হয়, এবং তামাকের সুগন্ধ ও নানা গব্য মিষ্টান্নের স্বাদুতা ঐ জীবাণুরই কয়েক জাতির (দ্বারা) সুসম্পন্ন হয়। কাজেই জীবাণু-বিদ্যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বাণিজ্য-শিল্প উভয়েই নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

উদ্ভিদ্ সকল কি প্রকারে বায়ুর নাইট্রোজেন (Nitrogen) সংগ্রহ করিয়া দেহস্থ করে, এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া তাহা জানা ছিল না। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে ক্ষেত্রস্থ এক প্রকার জীবাণু বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে। বৃক্ষ-মূলে বা ক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইহাদের সংগৃহীত নাইট্রোজেনই উদ্ভিদ্ সকল গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। কাজেই কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণও জীবাণু-বিদ্যাকে কৃষি-শাস্ত্রের অন্তর্গত করিতে চাহিতেছেন।

নানা ব্যাপারে জীবাণুর এই সকল কার্য্য দেখিয়া বহু জীবাণু হইতে বিশেষ বিশেষ জাতিকে পৃথক্ করিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুকে সুকৌশলে পৃথক্ করিয়া, কি প্রকার অবস্থা তাহাদের বংশবৃদ্ধির অনুকূল এবং কি প্রকার অবস্থায় পড়িলেই

বা তাহারা মরিয়া যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক নবতথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

বিশেষ বিশেষ রোগের জীবাণু ধরিতে হইলে তথ্যান্বেষিগণ প্রথমতঃ রুগ্ন প্রাণীর শরীরে যত প্রকার জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া দিয়া থাকেন, এবং পরে তাহাদের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল পাত্র জীবাণুর পুষ্টিকর কোন পদার্থে পূর্ণ রাখা হয়, এবং যাহাতে বাহিরের বাতাস হইতে নূতন জীবাণু আসিয়া পাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারও সুব্যবস্থা থাকে। এই পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায় যে কোন বিশেষ পীড়ায় রোগিশরীরে এক বিশেষ-জাতীয় জীবাণুরই বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তখন ঐ রোগের সহিত এই জীবাণুর নিশ্চয়ই কোন নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্থির হয়। ইহার পর পরীক্ষক ঐ সকল জীবাণুকে সুস্থ প্রাণীর রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই অবস্থায় যদি দেখা যায় যে, প্রাণীটি সেই বিশেষ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন ঐ জীবাণুগুলিকেই উক্ত রোগের উৎপাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে।

পীড়ার উৎপাদক জীবাণুকে পৃথক্ করার পর তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বায়ু, মৃত্তিকা, জীবশরীর, বা প্রাণিরক্ত-প্রভৃতি নানা পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি ঐ জীবাণুর স্বাস্থ্যের অনুকূল, তাহা সর্ব্বপ্রথমে স্থির করা হয়, এবং এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, ইহাদের বংশবৃদ্ধির নিয়ম আবিষ্কার করিবার আয়োজন করা হইয়া থাকে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, অপুষ্পক উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি দেখা যায়। এই সকল উদ্ভিদের পত্রাদিতে এক প্রকার বীজাণু (spores) জন্মায়, এবং ইহাই বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িলে, তাহা বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। পরীক্ষায় কতকগুলি জীবাণুর বংশবিস্তার অবিকল অপুষ্পক উদ্ভিদের ন্যায় হইতে দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া জীবদেহের একটিমাত্র কোষ যেমন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বহু কোষের উৎপত্তি করে, একটিমাত্র জীবাণুকেও ঠিক ঐ প্রকারে বিভক্ত হইয়া বহু জীবাণুর উৎপত্তি করিতে দেখা গিয়াছে।

যক্ষ্মা রোগের জীবাণুগুলি এ পর্য্যন্ত পরভুক্ (parasit) শ্রেণীর জীব বলিয়া স্থির ছিল। জীবাণুবিদ্ মাত্রেই বলিতেন প্রাণীর রক্তের অনুরূপ উষ্ণতা না পাইলে ইহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সম্প্রতি ইহাদের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, শীতল স্থানেও ইহারা সজীব থাকিতে পারে, কিন্তু রক্তের উষ্ণতা না পাইলে ইহারা সুস্থ থাকিতে পারে না এবং বংশবিস্তারেরও সুযোগ পায় না।

ধনুষ্টঙ্কার রোগের (tetanus) জীবাণু লইয়া অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহাদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, মৃত্তিকাতেই ইহারা গুপ্তাবস্থায় থাকে, এবং কোন ক্রমে প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় বংশবিস্তারের সুবিধা করিয়া লইতে পারিলেই, পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই সকল ব্যাধি-জীবাণু মৃত্তিকায় থাকিয়া কি প্রকারে খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং প্রাণিদেহ ব্যতীত অপর কোন বস্তুতে বংশবিস্তার করিতে পারে কি না, এই সকল প্রশ্নের আজও সুমীমাংসা হয় নাই।

নানা ব্যাধি-জীবাণু শরীরে আশ্রয় গ্রহণ

করিলে, প্রাণী সকল কি প্রকারে পীড়িত হইয়া পড়ে, এবং ইহাদের এই হানিকর কার্য্যে বাধা দিবার কোনও উপায় আছে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য এপর্য্যন্ত অনেক পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল, রোগীর শরীর যখন কোটী কোটী জীবাণুতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন বুঝি প্রাণীর শরীরটাকেই উহারা খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার ক্ষয় সাধন করে। আজ কাল এই সিদ্ধান্তটিকে সকলে ভুল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, জীবাণুগুলি সত্যই নিজেরা সুশীল জীব। ইহারা নিজের শরীর হইতে বা আশ্রিত প্রাণীর শরীর হইতে যে একপ্রকার বিষময় পদার্থ (toxin) নির্গত করে, তাহাই যত অনিষ্টের মূল। প্রাণিদেহের কণাপ্রমাণ অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া লক্ষ লক্ষ জীবাণু বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু ইহারা তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া কি উদ্দেশে বিষময় পদার্থ নির্গত করিয়া আশ্রিত প্রাণীর প্রাণনাশ করে, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

বাহিরের প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য সৃষ্টির সকল বস্তুকেই জগদীশ্বর সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। গাছ যতই দীর্ঘ হয়, তাহার কাণ্ডও ততই কঠিন হয়। প্রবল ঝড়ের আঘাত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য এই বিধান। পুষ্প-পত্রের অঙ্কুরগুলি কত যত্নে বৃক্ষে ঢাকা থাকে। শীতাতপ ও কীটপতঙ্গের উপদ্রব হইতে রক্ষা করার জন্যই এই সুব্যবস্থা। আকাশ ও মৃত্তিকায় সহস্র সহস্র ব্যাধি-জীবাণুর মধ্যে যখন প্রাণীমাত্রকেই সর্ব্বদা বিচরণ করিতে হয়, তখন এই সকল বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য কোনপ্রকার বিধান কি প্রাণি দেহে নাই? সত্যই ঐপ্রকার এক সুব্যবস্থা প্রাণিশরীরে ধরা পড়িয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবাণু সকল যখন সেই বিষময় পদার্থ (toxin) উৎপন্ন করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দেহ হইতে এক প্রকার বিষঘ্নপদার্থও (Antitoxin) স্বতঃই নির্গত হইয়া পড়ে। রোগীর শরীরে কিছু দিন ধরিয়া ঐ দুই পদার্থের ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলে, এবং শেষে অবস্থা-বিশেষে কোন এক পক্ষ জয়ী হইয়া রোগীকে রোগবর্জ্জিত বা মৃত করিয়া ফেলে।

ডিপথিরিয়া ও প্লেগ্ প্রভৃতি নানা ব্যাধির টিকা দিবার কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এই সকল টিকার বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমে কোন বিশেষ ব্যাধির জীবাণু অতি অল্পমাত্রায় কোনও নিকৃষ্ট প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। ইহাতে দেহাভ্যন্তরে যে অত্যল্প বিষের উৎপত্তি হয়, তাহা শরীরস্থ সেই বিষঘ্ন পদার্থ দ্বারা সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে একই প্রাণীর দেহে বর্দ্ধিতমাত্রায় জীবাণু প্রবেশ করাইতে থাকিলে বিষঘ্ন বস্তুটা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া পড়ে, যে তখন পীড়ার জীবাণু প্রাণীটির কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। এই প্রকার প্রাণীর শোণিতই টিকার বীজ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্য-রক্তের সংস্পর্শে আসিলেই শরীরস্থ বিষঘ্ন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কাজেই যখন সেই লোকটি সত্যই রোগাক্রান্ত হয়, তখন বিষ ও বিষঘ্ন পদার্থের সংগ্রামে বিষঘ্নই জয়যুক্ত হইয়া পড়ে।

টিকাদ্বারা প্রযুক্ত বিষঘ্নপদার্থ কিপ্রকারে মনুষ্য দেহে আজীবন সঞ্চিত থাকে,

এই রহস্যের আজও মীমাংসা হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, প্রযুক্ত বিষয়-ণ যেটা সত্য সত্য প্রাণিদেহে সঞ্চিত থাকে না। ইহা দ্বারা আবশ্যকমত বিষঘ্নপদার্থ প্রস্তুত করিবার একটা অভ্যাস উৎপন্ন হয় মাত্র। কাজেই যখন জীবাণুর আক্রমণে দেহ সত্যই বিষযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন পূর্ব্বের অভ্যাস মত প্রচুর বিষঘ্নপদার্থ উৎপন্ন হইয়া বিষের ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে।

প্রাণিরক্তস্থ শ্বেতকণাগুলি (White blood corpuscles) নানা বিষের উপদ্রব হইতে শরীরকে রক্ষা করে। কণ্ঠনালীর প্রবেশ-পথ এবং হস্তপদাদির সন্ধিস্থল ইহাদের বাসস্থান। নগরের লোকবহুল স্থানে প্রহরী বসাইয়া আমরা যেমন দুষ্টলোকের উপদ্রব হইতে নাগরিকগণকে রক্ষা করি, রক্তের শ্বেতকণাগুলিও সেইপ্রকার শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিয়া, রক্তস্থ দুষ্ট অংশগুলির পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়, এবং শেষে সেগুলিকে একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। কিছুদিন পূর্ব্বে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল, বিষঘ্নপদার্থ টিকার সহিত দেহে প্রবিষ্ট হইলে, বুঝি ঐ শ্বেতকণাগুলিকেই শক্তিশালী করিয়া তুলে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ঐ অনুমান ঠিক্ হয় নাই। শ্বেতকণাসকল যেমন জীবাণু-প্রভৃতি হানিকর পদার্থকে হাতে পাইলেই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে, বিষঘ্নপদার্থও (Antitoxin) ঠিক্ সেইপ্রকারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবাণুবিশেষের ক্ষয় সাধন করে।

ব্যাধি-জীবাণুর নানা অপকারিতার কথা ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ায়, ইহাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আজকাল অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। আবার যে সকল জীবাণু মৃত্তিকার উর্ব্বরতাদি বৃদ্ধি করিয়া অশেষপ্রকারে মনুষ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহাদিগকে পালন করিবার জন্যও অনেক কল্পনা চলিতেছে। সূচ্যগ্র-প্রমাণ স্থানে যে জীবাণুর শত-শতটি অনায়াসে বাস করিতে পারে, তাহাদের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন ব্যাপার, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। তথাপি লর্ড লিষ্টার-(Lord Lister) প্রমুখ পণ্ডিতগণ জীবাণুর উপদ্রব শান্তির জন্য যে সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রতি বৎসর সহস্র-সহস্র লোক মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইতেছে।

আহার কার্য্যটা প্রাণীর যেমন হিতকর, তেমনি বিপজ্জনক। এক আহারই বাহিরের শত্রুকে ঘরে আহ্বান করিয়া আনে। আজকাল এই বিপদের দিক্‌টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। খাদ্য-পানীয়ের সহিত যাহাতে ব্যাধি-জীবাণু শরীরস্থ হইতে না পারে, তজ্জন্য আজকাল নানা উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, পদার্থের উষ্ণতা ৭০ অংশে পৌঁছিলে, তাহাতে কোন জীবাণুই সজীব অবস্থায় থাকিতে পারে না; এবং তাহা ক্রমে বাড়িয়া ফুটন্ত জলের উষ্ণতা অর্থাৎ ১০০ অংশে উঠিলে তখন জীবাণুর বীজ (spores) পর্য্যন্ত ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যে সকল খাদ্যে ব্যাধি-জীবাণুর অস্তিত্ব সম্ভাবনা থাকে, সে গুলিকে আহারের অনতিকাল পূর্ব্বে বেশ গরম করিয়া লইবার জন্য অনেকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

মৃত্যুর সহস্র সহস্র পথ উন্মুক্ত রাখিয়াও, নানা জাতীয় ব্যাধি-জীবাণুর সৃষ্টি-দ্বারা মৃত্যুর আর একটা নূতন পথ উদ্ঘা-

টন করার মূলে জগদীশ্বরের কি মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা স্থির করা সত্যই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। জীবাণুগুলিকে দেহশত্রু রূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অপকারিতা ক্ষালনের জন্য দেহে এত সুব্যবস্থা করিবারই বা উদ্দেশ্য কি, তাহাও আমরা বুঝি না। জগদীশ্বরের শাসন-বিধানের শত শত ব্যাপারের ন্যায়, ইহাও বোধ হয় চিররহস্যময় থাকিয়া যাইবে।

নানা কথা।

ধর্ম্মপ্রচারক।—১০ই আগষ্ট তারিখের Christian lifeএ প্রকাশ যে বর্ত্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন (theological school) ধর্ম্ম-শিক্ষাগারে ছাত্রের সংখ্যা ৭৪০১ জন। বিগত ১৫ বৎসরের ভিতরে উহার বিশেষ তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় নাই। ঐ দেশে ১৮৮০ সালে যে লোকসংখ্যা গৃহীত হয়, তাহাতে ৭৭৫ জনের উপর একজন, এবং ১৯০০ সালের লোকগণনায় ৬৮১ জনের উপর একজন ধর্ম্মযাজকের পরিচয় মিলে। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, যে যাজকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেও সুশিক্ষিত যাজকসংখ্যা সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। এদেশে চতুষ্পাটী ও সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রসংখ্যা ও হ্রাস পাইতেছে। ইহা যে বাস্তবিকই দেশের দুর্গতির পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

খৃষ্ট-সমাজ।—খৃষ্টান সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা আছে। মতামত পার্থক্যই উহার অন্যতম কারণ। ঐ সকল দলের মধ্যে যাহাতে মিলন হয়, তৎসম্বন্ধে উদারচেতাগণ বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। অবশ্য রোমাণকাথোলিকদিগের সহিত মিলন ঘটা সহজে সম্ভবপর নহে।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী—ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হইতে সাধকগণ একে একে বিদায় লাভ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। জীবনে ও সাধনে—ধর্ম্ম, তর্কে বা মতে নহে, একথা অনেকেরই ঠিক হৃদ্গত হইতেছে না। সকলে নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু এ কথা স্মরণে রাখিতে হইবে, যে আধ্যাত্মিক সম্পদ-বাহুল্য যতদিন না প্রতিব্রাহ্মের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইবে, এবং এরূপ লোকের সংখ্যা ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে প্রবর্দ্ধিত না হইবে, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। জীবনে নিষ্ঠায় রামতনু বাবুর অদ্বিতীয় বিশেষত্ব ছিল। কয়েক বৎসর হইল, আমরা দেখিয়াছি, যে ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব আদি-ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ভূতলে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় রামতনু বাবু দ্বিতীয়তলে পদচারণা করিতেছেন। জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন, ভূতলে আমার উঠিবার সামর্থ্য নাই জানিয়াও বাটী হইতে আসিয়াছি; কি করিব, আজ মাঘোৎসবের দিন, মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বাড়িতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না, উপরে উৎসব হইতেছে, সব শুনিতে পাইতেছি না বটে, তথাপি এখানে আসিয়া মন তৃপ্তিলাভ করিল, উহার ব্যাকুলতা খর্ব্ব হইয়া আসিল। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ নিষ্ঠার কয়টি নিদর্শন দেখাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ, স্বর্গীয় রামতনু বাবুর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, আমরা আহ্লাদের সহিত উহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মিকী তমসাতীরে বসিয়া গাহিয়া গিয়াছেন,—

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যাণাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

কুসুম-সৌরভ কেবল অনুকূল বায়ুভরেই বিকীর্ণ হয়, কিন্তু মানুষের ধর্ম্মজীবনের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকেই প্রসৃত হইয়া থাকে। বঙ্গীয় কবিও কহিয়াছেন,—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

তিনিই সুকৃতিমান, যিনি দেশের লোকের মনোমন্দিরে নিত্য সেবা পাইয়া থাকেন। বাহিরের মন্দিরে যাঁহার পূজা হয়, অনেক সময় সে পূজার উপকরণাদি যোগাড় লইয়া বিব্রত হইতে হয়; কিন্তু মনোমন্দিরে যাঁহার আসন, তাঁহার সেবার জন্য দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহে ছুটাছুটি করিতে হয় না—ভক্তিচন্দনে প্রেমপুষ্প চর্চ্চিত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালেই সে পূজাকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মানবজগতে সাধারণ মানবচক্ষে তিনি মৃত হইলেও, তাঁহার পার্থিব দেহ ধূলিরাশিতে মিশিয়া গেলেও, তাঁহার জীবনের প্রভাব চিরদিনই মানুষকে ধর্ম্মে ও নীতিতে অনুপ্রাণিত করে।

লাহিড়ী মহাশয় আজীবন শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, বিদ্যার্থিগণের কোমল হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজের

সহিত পবিত্রতা সত্যনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তির বীজও বপন করিতে যত্ন করিতেন। বালকগণের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তি জন্মানই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ও লক্ষ্য ছিল। অসত্যকে এবং অন্যায়কে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। নিতান্ত বন্ধু কিম্বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও অন্যায় করিলে তিনি কিছুতেই তাহা নীরবে সহ্য করিতেন না। কবিবর দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন,—

"একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন।"

বাস্তবিক মানুষের মনের উপর এমন নৈতিক প্রভাব যিনি বিস্তার করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ।

ঝটিকাসংক্ষুব্ধ অন্ধকারময় সাগর-বক্ষে পোতাধ্যক্ষ যেমন দূরস্থিত আলোকস্তম্ভের ক্ষীণ স্থিরালোক দেখিয়া আপনার গতি নির্দ্দেশ করে, তেমনি অশেষ দুঃখদুর্দ্দশা-পূর্ণ সংসারসাগরে মানুষ যখন নানা বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া যায়, তখন সাধুপুরুষদিগের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে প্রাণে বল আইসে; কেমন ধীর ও স্থির ভাবে তাঁহারা জ্বালা যন্ত্রণা উৎপীড়নাদি সহ্য করিয়াছেন, চিন্তা করিতে গিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, ক্রমে কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি আইসে। লাহিড়ীমহাশয় জীবনে বহু দুঃখ শোক সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ঋষির ন্যায় এক-দিনের তরেও তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসের ছায়াপাতে মলিন হয় নাই। আজকাল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তি হইয়াছে, এখন আর ব্রহ্মভক্তগণ লোকের চক্ষে হেয় নহেন—এখন ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্ব্বস্থানেই পূজিত ও আদৃত। কিন্তু যখন লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অশেষ গঞ্জনা ও পীড়া সহ্য করিতে হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মগণের সমাজ আছে, স্থান আছে, সব আছে, তখন কিছুই ছিল না। অথচ এই দৃঢ়চিত্ত পুরুষ তখনই ভগবানের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে প্রাণ সবল করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ ও ছাত্রগণ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র দেখিয়া তাঁহাকে চিরকাল দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন; তাঁহারাই বিপদের সময় নানা রূপে তাঁহার যন্ত্রণালাঘব করিতে সযত্ন হইতেন। কিন্তু ভগবানে যিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, পার্থিব দুঃখকষ্টে কি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে? জলযানস্থিত কম্পাসের কাঁটা, তরণী নানা দিকে ঘুরিলেও, প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত হইলেও, যেমন উত্তর দিকই নির্দ্দেশ করে, তেমনি পৃথিবীতে তিনি নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইলেও, তাঁহার মন, চিরকাল করুণাময় ভগবানের চরণেই নিবদ্ধ ছিল।

১৮৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে যান। লাহিড়ী মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া আগ্রহে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিবেন, এইজন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। আহ্লাদে তাঁহার ঋষিমূর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এমন আগ্রহের সহিত কথোপকথন হইল, যাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র বাবু প্রস্থানকালে লিখিয়াছিলেনঃ—

১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭।

অনেক বৎসর পরে আজ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সেই যৌবনের স্ফূর্ত্তি উৎসাহ উদ্যম—সেই অটল জ্ঞানস্পৃহা, সেই সকল পুরাণ কথা মনে পড়িল। এখন আর সে ভাব নাই—বার্দ্ধক্যের মুখশ্রীতে আর এক অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। রামতনু বাবুর ঠিক বয়স কত জানি না; তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল এখনো সতেজ দেখিলাম—স্মরণশক্তিও জাগ্রত। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহরা পা যদিও পৃথিবীর ধূলি স্পর্শ করিতেছে—কিন্তু তাঁহার আত্মা আশা ভরসা সকলি স্বর্গের দিকে উন্নত।

"As some tall cliff that lifts its awful form,
Swells from the vale, and midway leaves the storm,
Though round its breast the rolling clouds are spread,
Eternal sun-shine settles on its head."

বিশাল অটল যেন হিমগিরিবর,
মেঘমালা ভেদ করি পরশে অম্বর;
ঘনঘটা ঝঞ্ঝা বায় ছায় বক্ষোপরে,
অখণ্ড তপন তাপ জ্বলিছে শিখরে।

এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনালেখ্য দর্শনে আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার হয়।

'Lives of great men oft remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time.—

'Footprints that perhaps another,
Sailing over life's solemn main
A farlorn and shipwrecked brother
Seeing may take heart again.

Let us then be up and doing,
With a heart for any fate
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait."

মহত-চরিত দেখি মনা হয় মনে,
মহত হইতে পারি আমরা যতনে ;
রেখে যেতে পারি, ছাড়ি সংসারনিলয়,
কালের সাগর-তটে পদচিহ্নচয়—

সেই চিহ্ন হেরি কোন ভগ্নতরী জন,
দুস্তর ভব-সাগরে করি সন্তরণ,
তখন হৃদয় অতি বিগত ভরসা
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা।

উঠ তবে লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর,
যা হয় হোক্ না কেন নাহি তাহে ডর।
উঠে পড়ে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম,
শ্রম করি ধৈর্য্য ধরি—এই সার মর্ম্ম।"

সিদ্ধিলাভ বহু সাধনা সাপেক্ষ। সংসারে দুঃখ কষ্ট অনেককেই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত নীরবে মস্তকোপরি সহ্য করাই মহাপুরুষের লক্ষণ। লাহিড়ী মহাশয় জীবনে বহু পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনটি হইতেই কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করেন নাই। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখিয়া অক্ষতমানে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল এবং পবিত্র জীবনের সংস্রবে যিনি আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সরলতা সত্যনিষ্ঠা ও ভগবৎ প্রেমের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।"

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৪৪৸৵১
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭০৩৷৵০
সমষ্টি	...	৩১৪৮৷৶১
ব্যয়	...	৪১৪ ৵১০
স্থিত	...	২৭৩৪।৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৪০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৩৩৪।৩
২৭৩৪।৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩১১।৶১

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲
বড়বাজার পোঃ আঃ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত
১১১৷৶১
৩১১৷৶১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৪৵০
পুস্তকালয়	...	৮৷৵০
যন্ত্রালয়	...	৪৬৲
গচ্ছিত	...	৪৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	২০৲
সমষ্টি	...	৪৪৪৸৵১

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৯/৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৲
পুস্তকালয়	...	৪৶৬
যন্ত্রালয়	...	১৪৬৸৵০
সমষ্টি	...	৪১৪৵১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের চতুঃপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।
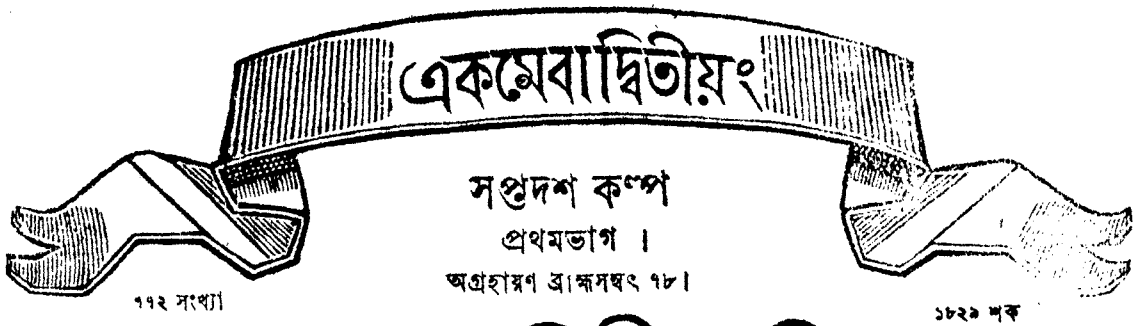
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

অদৃশ্যম গ্রাহ্যং ।

পরমেশ্বর অদৃশ্য—চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না—জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে দেখা চাই। এমন কত পদার্থ আছে, যাহা আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না—তাই বলিয়া কি তাহাদের অস্তিত্ব নাই? কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর—যেমন তাড়িত—মাধ্যাকর্ষণ—ইথার, তাহাদের অস্তিত্ব কি আমরা বিশ্বাস করি না? উপরে দূরস্থিত নক্ষত্র-রাজি দীপ্তি পাইতেছে, একবিন্দু জলে অসংখ্য কীটাণুপুঞ্জ রহিয়াছে, কিন্তু এ চক্ষে দেখিতে পাই না, দিব্যচক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে হয়—দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্ব প্রতীতি হয়। পরব্রহ্মও সেইরূপ। সেই নিরাকারকে দেখিতে আমাদের দিব্যচক্ষু চাই—জ্ঞাননেত্র চাই। চক্ষু যদি রোগাক্রান্ত হয়, সে যেমন দেখিতে পায় না, আমাদের মনশ্চক্ষুও সেইরূপ। সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী পুরুষ—তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন—আমরা অন্ধ, তাই তাঁহাকে দেখিতে পাই না। কে অন্ধ করিয়াছে?—না দুশ্চিন্তা—কুপ্রবৃত্তি—পাপপ্রলোভন—বিষয়াসক্তি। আমরা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টিহীন—দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। যদি সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, সে তাঁহাকে দেখাইতে পারে না—চন্দ্র তারা অগ্নিও তাঁহার সন্ধান দিতে পারে না। তখন গীতোক্ত কথা সপ্রমাণ হয়

> নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
> মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ং।

যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়া আমি লোকের নিকট অপ্রকাশ থাকি—তাই মূঢ় আমাকে দেখিতে পায় না।

তিনি সর্ব্বসাক্ষী জগতের পিতামাতা। এমন কি হইতে পারে, তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে আমাদের দেখা দিবেন না? না—কখনই না—যে চায় সেই পায়। তাঁকে দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে তাঁর দ্বারে আঘাত করিলেই তিনি দ্বার খুলিয়া দিয়া গ্রহণ করিবেন—কেন না

> "সনোবন্ধুর্জনিতা সবিধাতা"

তিনি আমাদের বন্ধু—পিতা—তিনি বিধাতা—তাঁর প্রেমদৃষ্টি আমাদের উপর সর্ব্বদাই রহিয়াছে। তিনি চান কখন্ আমরা

তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই। আমরা সেই মায়ের ডাক শুনিয়াও শুনি না। আমরা সাধন-ভজনহীন হইয়া আপনারাই তাঁহাতে আমাতে ব্যবধান করিয়া রাখি।

মনে করিয়া দেখুন, আপনাকে পবিত্র না করিলে সেই পবিত্রস্বরূপকে কিরূপে দেখিতে পাইব? কিন্তু পবিত্র হইব কি উপায়ে? সদাচার শুদ্ধাচার ধর্ম্মানুষ্ঠান উহার উপায়। মহাত্মা ঈশা বলিয়া গিয়াছেন—শুদ্ধান্তঃকরণেরা ধন্য,কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন। আমরা যদি তাঁর দর্শনলাভ করিতে চাই, তবে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইতে হইবে। আমরা পাপে কলঙ্কিত, তাই আধ্যাত্মিক চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, ইহা নিশ্চয় সত্য। সাধুসজ্জনের চরিত্র দেখ তাঁহারা তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধ হইয়া থাকি—যে সমস্ত সাধন নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন করি না। সুতরাং যিনি দ্রষ্টব্যের মধ্যে পরম দ্রষ্টব্য, তিনি আমাদের নিকট অদৃশ্য থাকেন।

হে ভক্ত সজ্জন! তোমরা যদি সেই ভক্তবৎসলকে দেখিতে চাও—হৃদয়ের অন্তঃপুরে গিয়া সেই মায়ের কাছে দাঁড়াও—বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া নির্জনে ধ্যান কর—হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া একান্তচিত্তে ভজনা কর।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্বস্ততস্তুতং
পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

জ্ঞান প্রসাদে পবিত্র হইয়া ধ্যানযোগে তাঁহার দর্শন পাইবে। একটা কথা মনে রেখ, ব্রহ্মসম্মিলনের পূর্ব্বে ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করা চাই। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত সম্মিলন করিতে হইলে ব্রহ্মের সঙ্গে সমান হওয়া চাই। তাঁহার সঙ্গে সমান হইবার উপায় এই—তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছাকে এক করা।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

শুদ্ধাচারী শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। প্রখর বুদ্ধি যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে, সরল হৃদয়ে তাঁর নিকটে গেলে অচিরাৎ তিনি দেখা দেন। "ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে; প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফিরে।"

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ সেই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় কি না—তাঁর কথা শোনা যায় কি না। কেবল মুখে বলা নয়, হৃদয়ে অনুভব কর। তোমাদিগকে সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে, চক্ষু যাঁকে দেখে নাই—কর্ণ যাঁর কথা শুনে নাই, আমরা তাঁকে দেখিয়াছি—জানিয়াছি। হাঁ! আমরা দেখিয়াছি—আমরা তাঁর কথা শুনিয়াছি—সহজ ভাবে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে হৃদয়-মন্দিরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ইহা তোমার দিগকে প্রকাশ করিতে হইবে—জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে হইবে। বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করিলে বুঝিতে পারিবে, সাকার কল্পনা অনাবশ্যক—মূর্ত্তি গড়িবার প্রয়োজন নাই—আত্মায় আত্মায় সম্মিলন হয়—ইহা জগদ্বাসীর নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে যেমন দেবী পূজার বাদ্যোদ্যম গগণভেদ করিয়া উঠিতেছে—তোমরা ও তেমনি উচ্চরবে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম ঘোষণা কর, তোমাদের জীবনে দেখাও সেই নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে তেমনি স্পষ্ট রূপে দর্শন করা যায়—

করতলন্যস্ত আমলকবৎ স্পর্শ করা যায়। সেই সত্যং শিবং সুন্দরং—সেই করুণাময়ী মা তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তিনি হিমালয় হইতে তিন দিনের জন্য আসিয়াছেন, তা নয়। গেলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়, ডাকিলেই তিনি সাড়া দেন। তখন জগৎবাসীর সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারিবে

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

হে অমৃতধাম-নিবাসী দেবতা সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রেয় ও প্রেয়।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ো-
স্তেউভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ যউ প্রেয়ো বৃণীতে।

এক শ্রেয় এক প্রেয়, ইহারা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পুরুষকে আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁর মঙ্গল হয়। আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

কঠোপনিষদে আছে যে এই উপদেশ নচিকেতা যমের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। নচিকেতার উপাখ্যান এইঃ—নচিকেতার পিতা বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্বদান সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দান-সামগ্রীর মধ্যে কতকগুলি অস্থিচর্ম্মসার রুগ্ন বন্ধ্যা গাভী দেখিয়া নচিকেতার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন "পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়া"—এইরূপ গো দানে পুণ্য লাভ হয় না বরং নিরানন্দ লোকে অধোগতিই হয়। তাই তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।

হে পিতঃ! আমাকে কোন্ যজমানকে দান করিবেন? বার বার জিজ্ঞাসা করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন

মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।

আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করব। বলিয়াই তাঁহার পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হইল, হঠাৎ রাগের মুখে কি বলিয়া ফেলিলাম। এই শাপে না জানি আমার পুত্রের গতি কি হইবে? কিন্তু নচিকেতার মন বিচলিত হইবার নহে। তিনি বিস্তর অনুনয় করিয়া পিতাকে বলিলেন, আপনি যখন একবার কথা দিয়াছেন, তখন অন্যথা করা উচিত হয় না।

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে

পিতৃপিতামহদের চরিত অনুধাবধন করিয়া দেখুন—বর্ত্তমানে অন্যান্য সাধু পুরুষদের ব্যবহার দৃষ্টি করুন; তাঁহারা কখন কথা দিয়া সত্য হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। সুতরাং মুনি অগত্যা সম্মতি দিলেন—নচিকেতাও যমালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন যম বাড়ি নাই—তিন দিন নিরাহারে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পরে যমরাজা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, যে একজন ব্রাহ্মণ-অতিথি গৃহে অনশনে তিন দিন রহিয়াছেন। এ ত ভয়ানক কথা। ব্রাহ্মণ-অতিথির যথোচিত আতিথ্য না হইলে আশা প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়—প্রিয়বাক্য যজন যাজনের পুণ্যফল নষ্ট হয়—অতএব ইহার কোন প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। তাই তিনি নচিকেতাকে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—হে ব্রহ্মণ্! তুমি আমার গৃহে অনশনে তিন রাত্রি যাপন করিয়াছ—ইহার প্রতিকার-স্বরূপ তিনটি বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। নচিকেতা

বলিলেন আমার পিতা গৌতম যাহাতে আমার প্রতি শান্তসঙ্কল্পও সুপ্রসন্ন হন—আমি এখান থেকে ফিরিয়া গেলে আমাকে সস্নেহে অভিবাদন করেন—তিন বরের মধ্যে এই আমার প্রথম বর। যম তথাস্তু বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় বর—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি
উভে তীর্ত্বা হশনায়াপিপাসে
শোকতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।
সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্ধধানায় মহ্যং
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে
এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ।

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই—হে মৃত্যু তুমি ও সেখানে নাই। জরার ও ভয় নাই—লোকে ক্ষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া বীতশোক হইয়া স্বর্গলোকে রমণ করে। স্বর্গলোকে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। এই স্বর্গলাভের উপযোগী যে অগ্নি, তা তুমি জান। শ্রদ্ধধান যে আমি আমাকে সেই অগ্নির উপদেশ দেও। আমি এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।

যম এই অগ্নিচয়নের সমুদায় প্রণালী শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন এবং প্রীত হইয়া আরো বলিলেন, হে নচিকেতঃ! এই অগ্নি তোমার নামেই অভিহিত হইবে। ইহার নাম—নাচিকেত-অগ্নি রাখা হইবে। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা বলিলেন

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বর স্তৃতীয়ঃ।

প্রেতাত্মা বিষয়ে মনুষ্যের মনে যে সংশয় আছে—কেহ বলে আত্মা অমর কেহ বলে মরণশীল, এ বিষয়ের তথ্য আমাকে বলিয়া দাও এই আমায় তৃতীয় বর। যম উত্তর করিলেন, দেবতারাও পূর্ব্বে এ বিষয়ে সংশয়বাদী ছিলেন। এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সুজ্ঞেয় নহে। নচিকেত! এ বর পরিত্যাগ কর, ক্ষান্ত হও; আমাকে আর উপরোধ করিও না। অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা বলিলেন আপনি বলিতেছেন দেবতারা এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ-চিত্ত, ইহা সুজ্ঞেয় নহে। আপনার মত এ তত্ত্বের উপদেষ্টা কোথায় পাইব? আমি এই বর চাই, অন্য বরের প্রার্থী নহি। যম বলিলেন, শতায়ু পুত্র পৌত্র প্রার্থনা কর, অনেক পশু হস্তি হিরণ্য অশ্ব, বৃহদায়তন ভূমি, যাহা চাও তাহা দিব। যত কাল ইচ্ছা জীবিত থাকিবে; বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা হও; আমি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিব। মর্ত্ত্যলোকে যে যে কামনা দুর্লভ—বিত্ত দীর্ঘায়ু সরথা সতূর্য্যা অপ্সরা তাহা এক এক করিয়া বল, আমি সকলি দিব কিন্তু মৃত্যু বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিও না। নচিকেতা বলিলেন এই সকল পদার্থ 'শ্বোভাবা' ক্ষণস্থায়ী—আজ আছে কাল নাই। ইহারা সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে—আর এই যে পরমায়ু—সুদীর্ঘ হইলেও ইহা অল্প। হে যমরাজ—এই অশ্ব রথ নৃত্য গীতাদি তোমারই থাকুক।

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎত্বা
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।

বিত্তেতে মানুষের তৃপ্তি নাই—যখন তোমাকে দেখিয়াছি তখন বিত্তের অভাব কি? যতকাল তুমি রাজত্ব করিবে ততকাল আমরা জীবিত থাকিব। তোমার নিকটে আমি এ সকল কিছু চাহি না—আমি যে বর চাহিয়াছি, তাহাই আমার বরণীয়।

তখন নচিকেতার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মৃত্যু উপদেশ দিলেন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়োবৃণীতে।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথে আকর্ষণ করে, ধীর ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া লন; যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। নচিকেতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যম আরো বলিলেন, হে নচিকেতঃ তুমি এই প্রিয় ও প্রিয়রূপ কামনা সকল পরিত্যাগ করিলে—এই বিত্তময়ী পন্থা--এই ধনলালসা যাহাতে বহুতর লোক নিমগ্ন হয়, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে—তুমি ধন্য।

এই পৃথিবীতে শ্রেয় ও প্রেয়ের সংগ্রাম নিয়তই চলিতেছে—এই উভয়ের টানাটানির মধ্যে আমরা বাস করিতেছি—কখন এ-পথে যাইতেছি,কখন ও-পথে যাইতেছি। একদিকে ইন্দ্রিয়সেবা যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেকিতা,অন্য দিকে আত্মপ্রসাদ পুণ্যপ্রভাব ধর্ম্ম এবং ঈশ্বর। অন্তর-হলাহল মধুরভাষী প্রেয় আসিয়া বলে—

"শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ। বহূন্ পশূন্ হস্তি হিরণ্যমশ্বান্।"

তুমি শতায়ুবিশিষ্ট পুত্র পৌত্র গ্রহণ কর; হস্তি-হিরণ্য অশ্ব-রথ তোমার জন্য সকলি প্রস্তুত। তুমি আমার পথবর্ত্তী হও; "সুগন্ধ গন্ধবহ তোমার শরীর শীতল করিবে, তোমার প্রাসাদে নৃত্য গীত হাস্য পরিহাস অহরহ উল্লাস বহন করিবে, ইন্দ্রিয়সুখদ গন্ধামোদ সকল তোমার চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে, মর্ত্ত্যলোকের দুর্লভ অপ্সরাগণ তোমাকে পরিচারণা করিবে; যত লোক তোমার পদানত হইবে, তুমি সকলের অধীশ্বর হইবে, তুমি মহদায়তন রাজ্যের রাজা হইবে—তোমার যশঃকীর্ত্তি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।

সুধীর সাধু যুবা প্রেয়ের এই সকল অনর্থকর মোহবাক্য শুনিয়া গম্ভীর মহাসাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর করিলেন

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।

তুমি যে প্রকার প্রলোভনে আমাকে ফেলিতে চাহ, ইহাতে অল্পকালের মধ্যে আমার সকল ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে; অন্তক আমার পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, রন্ধ্র পাইলেই আমার ধনপ্রাণ সকলি হরণ করিয়া লইবে; অতএব তোমার অশ্ব রথ নৃত্য গীত তোমারই থাকুক। তুমি যাহা কিছু দিতে পার, তাহাতে আমার তৃপ্তি কখনই হইবে না।

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।"

আমি কোন প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে ভুলিবার নহি। আমি জানি সংসার আমাকে শান্তি বিধান করে নাই, করিবে না। যদি তোমার নিকটে এমন কোন সুন্দর অমূল্য বস্তু থাকে যাহাতে প্রীতি স্থাপন করিলে আর সকলকে প্রীতি করা যায়, যাহা লাভ করিলে অক্ষয় শান্তি লাভ হয়, যদি এমন কোন অমূল্য ধন থাকে, তবে তাহা আমার হস্তে দিয়া আমার ব্যাকুলতাকে শান্তি কর, আমি চিরজীবনের নিমিত্তে তোমার পদানত দাস হইয়া থাকিব। ইহাতে প্রেয় মৌনী হইল ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এই প্রকার অবস্থাতে পতিত হইয়া যখন সেই সাধু যুবা বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিলেন, যখন অসহায় হইয়া জীবন-সহায়কে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন শুভ্রবসন মঙ্গলেচ্ছু শ্রেয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন,

তুমি কেন শোকে মগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তিহীন হইয়া অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ; যাঁর প্রীতি-সুধাতে জগৎসংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেমময় মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন কর এবং দুঃখসন্তপ্ত অশ্রু-ধারাকে প্রেমাশ্রুধারাতে পরিণত কর। যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় হয় না, যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না, তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর—মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আমাকে অবলম্বন কর, আমি তোমাকে সেই প্রেমময়ের অমৃত ক্রোড়ে লইয়া সমর্পণ করিব।

মঙ্গলময় শ্রেয়ের এই সকল নিগূঢ় হিতকর বাক্য শুনিয়া সেই সাধু যুবা পরমশরণ্য পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন এবং আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। সংসার তাঁহার নিকটে এক নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল; তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হইল। তিনি প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরেতে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিলেন এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমৃত লাভ করিলেন।"

শ্রেয় ও প্রেয় ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু হে বন্ধুগণ, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তোমাদের হস্তে।

তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

ধীর ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে ভালমন্দ বাছিয়া লন। তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন কর ত মঙ্গল, আর প্রেয়ের পথে যাও ত অমঙ্গল। তোমাদের আপনাদের উন্নতি অবনতি আপনাদেরই হাতে। তাই শাস্ত্রে বলে মনুষ্য আপনিই আপনার শত্রু, আপনিই আপনার বন্ধু। তোমার কর্ম্মফল—সুকৃত দুষ্কৃত—তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম করিবে, ক্রমে তাহা ভাল কিম্বা মন্দ অভ্যাসে পরিণত হইবে; অভ্যাস হইতে চরিত্র—চরিত্র হইতে ভাগ্য—ইহকাল পরকালের গতি নিরূপিত হইবে। ভাগ্যের নিন্দা করিও না—তোমার ভাগ্যের রচনাকর্ত্তা তুমি নিজেই—এই বুঝিয়া সাবধান হও। যদি কিছু করিতে হয় এখনি কর। আজ যাহা করিতে পার কালিকার জন্য ফেলিয়া রাখিও না। তোমার জীবন-তরির হাল তোমারই হাতে। হাল ধরিয়া থাক ত নৌকা ঠিক পথে চলিবে, আর হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়া যাও ত নৌকাডুবি হইয়া মহা বিপদে পড়িবে।

মন যদি ছুটি চলে
ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান
বায়ু যথা তরণী ডুবায়।

প্রেয়ের পথ এইরূপ শঙ্কটাকীর্ণ। আর যদি তোমরা নচিকেতার ন্যায় প্রেয়ের প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর, তবে তোমরাও মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিয়া অমৃত লাভ করিবে—অমৃত লাভ করিবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমরা তোমার উপর অবাত-কম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থির দৃষ্টি রাখিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট সরল সুপথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি এবং জীবনের কর্ম্ম সমাপন করিয়া নির্ভীক চিত্তে তোমার নিকটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি, এইরূপ অনুগ্রহ কর, প্রভু অনুগ্রহ কর।

দুর্গম পথ এ ভব গহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন !
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।
সন্ধ্যাবেলায়, লভিগো কুলায়
নিখিল-শরণ চরণে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পিতৃপূজা।

বেদ-উপনিষদের সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ-যুক্ত না হইলেও,বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাতে সমুৎপন্ন শারদীয়া মহাপূজা, ব্যাপককাল ধরিয়া আমাদের এই বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আশ্বিনের যে শুভ শুক্লপক্ষে এই জাতীয় মহোৎসব, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বপক্ষ পিতৃপূজার জন্য পরিনির্দ্দিষ্ট। প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মের অব্যবহিত পরেই যদি কেহ আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রীতি-কৃতজ্ঞতার বিমল অঞ্জলি পাইবার অধিকারী থাকেন, তবে তাহা আমাদের পিতা-মাতা ভিন্ন আর অন্য কেহ নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্মও তারস্বরে তাই ঘোষণা করিতেছেন "পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব"। কিন্তু যে পিতামাতা, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিনিধি, যাঁহাদের করুণা ও সহিষ্ণুতা একত্রে মিলিত হইয়া জীবনপথে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন, আমাদিগের কৃতজ্ঞতা কি কেবল ততদিনই তাঁহাদের অভিমুখীন থাকিবে? মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিয়া তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের ব্যাকুল-কৃতজ্ঞতার অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্য কি প্রতিধ্বনিত হইবে না? মৃত্যুর সঙ্গেই কি তাঁহাদের সহিত এই অযোগ্য পুত্র-কন্যার সকল সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যাইবে! স্নেহের কোমল বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে! কৃতজ্ঞতার বিমল উচ্ছ্বাস একেবারে বিশুষ্ক হইয়া যাইবে! তাহা কখনই হইতে পারে না।

হৃদয়কে সরল কর, ইহাই সকল ধর্ম্মের অনুশাসন ও শিক্ষা। প্রতিদিন যেমন ঈশ্বরকে স্মরণ করি, তেমনি তাহার সঙ্গে কি পরলোকগত পিতামাতাকে স্মরণ করিব না? ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঈপ্সিত সংসারের মঙ্গলকার্য্য কি সুসম্পন্ন করিব না? তাঁহারা আমাদের দুর্ব্বল হস্তে যাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ের রক্তবিন্দু দিয়া কি এইরূপ ক্ষুদ্র ভ্রাতা-ভগিনীকে পোষণ করিব না? নয়নের অন্তরালে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জীবন্ত ভাবে অনুভব করিয়া সভয়ে কি নিষ্কলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা করিব না? যথাযোগ্য পাত্রে স্নেহ দয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিব না?

জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব কি এই সকল চিন্তা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠে না! হায়! যদি পিতৃপিতামহ জননী-পিতৃজননীর জীবন্ত সত্তা—তাঁহাদের মৃত্যুর পরে, এখানে আমরা অনুভব করিতে শিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে ভ্রাতৃবিরোধ—কলহ বিষাদ—স্বজনদ্রোহ, লজ্জাতে ম্রিয়মান হইয়াও সংসারক্ষেত্র হইতে কবে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইত।

কর্ত্তব্যরাশি লইয়া আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, ইতর জন্তুর প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ হইলে চলিবে না। বিবাহের সময়—সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সন্ধিপথে শাস্ত্রের অনুশাসন এই "শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে" দ্বিপদ চতুষ্পদ সকল

প্রাণীর প্রতি অনুকূল হও; সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কর; আত্ম-চিন্তায় ও ঈশ্বর চিন্তায়—ধ্যানধারণা-সমাধিসাধনে তৎপর হও। যাঁহাদের নিকট হইতে জীবন পাইয়াছ, যাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছ, তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে ভিন্ন লোকে গমন করিলেও, অধ্যাত্ম-রাজ্যের অতি সূক্ষ্মতম অথচ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে তুমি এখনও তাঁহাদের সহিত স্নেহ-কৃতজ্ঞতার দ্বিবিধ তন্তুতে বিজড়িত। তাঁহারা যে লোকে থাকুন, তাঁহাদিগকে অতি নিকটে জানিয়া, তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট কাতরতার সহিত প্রার্থনা কর; বল তাঁহারা চিরতৃপ্তি লাভ করুন। হৃদয়কে আরও সরসতর ও উদারতর কর। যাঁহারা তোমার কুলে জাত—পুরুষ বা স্ত্রী যাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে তোমার বংশে বা অপরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের বংশলোপ হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের আপনার বলিবার আর কেহ নাই, "যেষাং নৈবান্যসিদ্ধিঃ," যাঁহারা তোমার পরিচিত, বা অপরিচিত, সকলেরই আত্মার উদ্দেশে দেবপ্রসাদ ভিক্ষা কর। সকল আত্মার পরমকল্যাণ—চরমশান্তি ভগবানের নিকট হইতে যাচ্ঞা কর। ইহাই এক ভাবে মনুষ্যত্ব সাধন। এ সাধনে পরলোকের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়, আধ্যাত্ম জগতের প্রতি প্রত্যয় জাগিয়া উঠে, এবং উহার সঙ্গে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাব বিমল ও সতেজ হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সত্যসত্যই কি পিতৃলোকে—আমাদের মাতাগণ—তাঁহাদের এই দুর্ব্বল পতিত সন্তানগণের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অপেক্ষা করেন। তাহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য নহে—কেন না তাঁহারা পারলৌকিক জগতে স্বীয় স্বীয় সাধনা বলে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ ত লাভ করিবেনই, কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের জন্য পিতৃপিতামহচিন্তা প্রতি মনুষ্যের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির চরিত্র অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবে যে জাতীয় রক্ষণশীলতার মূলে যদি কোন শক্তি কার্য্য করে, তবে তাহা দেশপ্রচলিত পিতৃপূজা তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। যে জাতি তাহার পিতৃপিতামহকে সহজে ভুলিতে চাহে না, তাহাদের কার্য্যে পিতৃপিতামহের অনুসরণ আপনা হইতেই স্থান পায়। সমাজের ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারের সময়, এই অন্ধ-অনুসরণ সে জাতিকে একেবারে চূর্ণ হইতে দেয় না। তাই এত বিপ্লবের ভিতর এখনও আমরা দাঁড়াইয়া আছি। যখন জ্ঞানের ক্ষীণালোক বাহির হইতে আরম্ভ হইল, রামমোহন রায়ের আকুল চেষ্টা পূর্ব্ব পিতামহগণের গ্রন্থরাশি উৎভেদ করিয়া সত্য, উপনিষদের জীর্ণ পত্র হইতে বাহির করিয়া দিল। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহ ধীরতার সহিত ঐ সকল সত্যরাজি চয়ন করিয়া উহাকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান করিল এবং বর্ত্তমান যুগে জাতিনির্ব্বিশেষে উন্নততম সাধকের পক্ষে উহাকে উপসেব্য করিয়া দিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদের প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহারই প্রসাদে এবং তাঁহারই যুক্তি তর্ক বলে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। যদি সত্যের আদর থাকে, জ্ঞানের মর্য্যাদা থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও, এই ধর্ম্ম সমস্ত ভার-

ক্ষের কেন সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইয়া এক দিন দণ্ডায়মান হইবে।

একই ধর্ম্মের উপাসক, ভ্রাতা ভগিনী আমরা। রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মক্ষেত্র এই ব্রাহ্মসমাজ। ইহারই কার্য্যে তাঁহারা দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। এই অনুকূল সময়ে ও এই পবিত্র স্থানে আইস আমরা সকলে জোড়করে কৃতজ্ঞতাভরে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার শান্তি-সাগরের পবিত্র মলয়-হিল্লোলে আমাদের ধর্ম্মপিতাগণকে সুশীতল করুন। তাঁহাদের আত্মার ক্ষুধা শান্ত করুন। তাঁহাদিগকে সুতৃপ্ত করুন। তিনি আপনার চরণের ছায়াতে নিয়তকাল তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। অদ্যকার দিনে তর্পণ-পক্ষে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা।

বৈদিককালের ব্রাহ্মণগণ, মনু ব্যাস কপিলাদি শাস্ত্রকারগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ, অতুল্যকীর্ত্তি সীতাপতি রামচন্দ্র, পঞ্চ পাণ্ডব সহ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম বিদুর নারদাদি ধর্ম্মবক্তাবর্গ এবং অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত সাধু ও আচার্য্যগণ, উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পরিস্ফূরণস্থল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব এই যে উহা সকল প্রকার বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক মূল ধর্ম্ম লইয়া সমুত্থিত হইয়াছেন। গীতা গ্রন্থ

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।
ঋষিভি বহুধা গীতং—

ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত সকল ব্যক্তিকে একত্র নিমন্ত্রণ করিবার আশায় ছিল, ব্রাহ্মসমাজ কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া সেই পরম দেবতার উপাসনার নিমিত্ত নিঃসঙ্কোচে সকল মনুষ্যকে সমাহ্বান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি একটী মন্দির বলিয়া ধরা যায়, তাহার ভিত্তিমূলপ্রস্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্য যেন খোদিত দেখা যাইবে—

অথ ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং।
কথমযথা ভবন্তি ভুবিদত্তপদানি নৃণাম্॥

ঋষিগণ একমাত্র তোমাতেই মন বাক্য ও কর্ম্ম অর্পণ করেন। মৃৎ পাষাণ ইষ্টকাদি যে কোন বস্তুর উপরে পদ রক্ষা কর, তাহাতে এক পৃথিবী আশ্রয় স্থান হয়েন, ইহার অন্যথা হইবে কেন?

ইহারই প্রতিধ্বনি প্রত্যেক শিবপূজকের মুখে বিশ্রুত হয়ঃ—

নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব!

ব্রাহ্মসমাজরূপ মন্দিরের অষ্টপৃষ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের এই মূল বাক্য অঙ্কিত বিবেচনা করা যায়ঃ—

বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলা যায়। তত্ত্ববিদ্গণ সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান্ বলেন।

একই পরমাত্মা নানা নামে আরাধিত হয়েন, মনু বাক্যে এমন ধ্বনি শুনা গিয়াছিল।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥

সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ প্রজাপতি মনু বলেন, কেহ ইন্দ্র বলেন, কেহ প্রাণ বলেন এবং অপর কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন।

ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ব্রহ্ম নামের সার্ব্বভৌমিকত্ব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ভাগবতোক্ত

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।"

এই তত্ত্ব সুব্যক্ত হইতেছে।

শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে অসম্যদর্শী লোকের মনে হইত, শাস্ত্রে যে পরমতত্ত্ব-বোধক ব্রহ্ম শব্দ দেখা যায়, তাহা অর্থবাদ (প্রশংসাপর বাক্য) মাত্র। এক্ষণে জ্ঞাতব্য শাস্ত্র সকল সম্পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায় সম্যগ্‌দর্শনে প্রত্যয় হইতেছে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন কোন শাস্ত্রেরই অর্থসঙ্গতি হয় না। বর্ত্তমান কালে নানা বিধানে যত শাস্ত্রব্যাখ্যা চলিতেছে, ততই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রচার-দ্বার ব্যায়ত হইতেছে।

যেমন গীতা গ্রন্থে তেমনি যোগবাশিষ্ঠে নিষ্কাম কর্ম্মের বহু উপদেশ আছে।

"যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি।"—গীতা

সেই উপদেশের সার। পরন্তু এই কর্ম্মক্ষেত্রে—ধরামণ্ডলের সর্ব্ববিভাগে প্রতিযোগিতামূলক নীতি এবং জয়-পরাজয় লক্ষণোপেত রাজসিক কর্ম্মের এত বাহুল্য হইতেছে যে এক্ষণে—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। গীতা ২।৩৭

এবম্বিধ উগ্রকাম কর্ম্মাত্মক উত্তেজনা বাক্যেরই অধিক প্রচার দেখা যায়। এমত অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিজ্ঞা করিয়া দাঁড়াইলেন, আত্মত্যাগী ও ঈশ্বর-প্রীতিকাম হইয়া সর্ব্বশক্তিতে লোকমঙ্গল সাধনা করিতে হইবে। তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি শিরোধার্য্য হইল,

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগেঽস্য সিদ্ধিদঃ।
১১।২০।৮

সাংসারিক কর্ম্মে ক্লিষ্টমনা হইবে না; অত্যন্ত আসক্তও হইবে না, ভক্তিযোগে ঈশ্বর-সেবা বোধে কর্ম্ম কর, তাহাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

নিঃশ্রেয়স বা পরম পুরুষার্থলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। এই পথে চলিতে চলিতে সুখ দুঃখ বন্ধন ও মুক্তির পরিচয় স্পষ্টতর হইতে থাকিবে। তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ সাধনা হইবে এবং ঈশ্বর নিষ্ঠায় ও ঈশ্বর কৃপায় সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল, ইহাতে জানা যাইবে যে,—ব্রাহ্মসমাজ "বিগতবিবাদং"। সর্ব্ব সাধারণ লোকের মধ্যে অবিরোধ অর্থাৎ শান্তি স্থাপন উদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু শ্রীমদ্‌গৌড়পাদাচার্য্যের সময় হইতে যে নির্ব্বিরোধ ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী বীজরূপে রোপিত হইয়া ছিল, মহাত্মা রামমোহন রায় তাহাতে জল সিঞ্চন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া এই বৃক্ষরূপে শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মূল দেশে যে রস সঞ্চারিত ছিল, শাখা প্রশাখায় তাহারই আস্বাদ মিলিবে, রসান্তর ঘটিবে না। যদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত কাহারও বিরোধাভাস ঘটে, তাহাতে এই তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইবে যে "অহম্পূর্ব্বমহম্পূর্ব্বম্" আমি অগ্রে আমি অগ্রে এবম্প্রকারে তিনি বা তাঁহার সম্প্রদায় ধর্ম্মপথে অগ্রগামী হইতে চাহিবেন।

তথাস্তু। ব্রাহ্মসমাজ কাহারও প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। তবে ব্রাহ্মসমাজের চিরদিনের কথা এই যে অধর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা কর, নতুবা ধর্ম্মের উন্নতি হইবে না, অজ্ঞান অপসারিত কর, নতুবা জ্ঞানের উন্নতি হইবে না।

অধর্ম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মকে পরাভূত করে। কালে কালে যুগে যুগে ধর্ম্মের এবম্প্রকার গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত নূতন

বিধানে কার্য্য হয়। সেই বিধানে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে।

ফলতঃ অজ্ঞান ধ্বংস এবং অধর্ম্মের পরাভব আবশ্যক। এতন্নিমিত্ত সর্ব্বদেশীয় গুরু আচার্য্য ও সর্ব্বভূতহিতেরত সাধুসজ্জনের অবিরাম যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ একনিষ্ঠায় তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন।

বর্ষা ও শরৎ ঋতু চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল। এই কালে এ দেশের লোক কর্ত্তৃক বিবিধ ব্রতের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্ম সমাজেও এই লক্ষণ দেখা যাইবে।

১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে এই আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহের দক্ষিণে প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসের মধ্য ভাগে অনন্তচতুর্দ্দশী তিথিতে ইংলণ্ডে মর্ত্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রবেশ করেন। তাহার ৬ বৎসর পরে দেবপ্রভাব দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে তত্ত্ববোধিনী-সভা স্থাপন করেন। তাহার ৪ বৎসর পরে ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম হয়।

এবম্প্রকারে ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মতত্ত্ব সংস্থাপনরূপ যে এক মহাব্রতের আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই কার্য্য উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে।

শান্তিশতকের কবি শিহ্লন মিশ্র খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

> সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপন
> ক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।

গৃহস্থেরা দুঃসহ শীতবাত তপন ক্লেশ সহ্য করে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের তপস্যা হয় না। যৌবনকালে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় প্রান্তে দুঃসহ শীত-বাত-তপন ক্লেশ সহ্য করিয়া রাজৈশ্বর্য্যশালী গৃহস্থের তপঃ প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সেই পথের পথিক হইতে সকলকে বলিতেছেন। তাহাতে বাস্তবিক তপস্বিজন সাধনীয় মহাপুণ্যের অর্জ্জন হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য।

অমূর্ত্ত্য ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা এই উন্নত লক্ষ্যের কতদূর অভিমুখীন হইলাম, ঈশ্বরের বিশাল সত্তা হৃদয়ে কতটা প্রতিভাত হইল, গন্তব্যপথে আমরা বাস্তবিকই অগ্রসর হইতেছি কি না, মধ্যে মধ্যে তাহার সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক। সমুদ্রতরঙ্গ চারিদিকে উথলিয়া উঠিতেছে, তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সমুদ্রবক্ষ ফেনিল হইয়া পড়িতেছে, নাবিক তাহার মধ্য দিয়া পোত সঞ্চালন করিয়া চলিতেছে। তাহার সমস্ত মনোযোগ সম্মুখে প্রসারিত মানচিত্রের উপরে—তাহার সমস্ত গণনা গ্রহ-উপগ্রহের সহিত যন্ত্রযোগে নিজ-সংস্থান নিরূপণে। সমুদ্রের ভীষণ কলরব কিছুতেই তাহাকে অন্যমনস্ক করিতে পারিতেছে না। যদি পারিত, বিপথে গিয়া গুপ্ত-শৈলের সংঘর্ষণে অর্ণব পোত অচিরে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

নাবিকের কর্ত্তব্য কি, অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে, প্রথম কর্ত্তব্য আত্মসংস্থান-নিরূপণে অর্থাৎ কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা স্থির করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কি না, যে দিকে যাইতে হইবে অর্ণবপোতকে তাহার অভিমুখীন করিয়া পরিচালন করা এবং বায়ুকে আয়ত্তের ভিতরে আনিয়া গতিবেগ প্রবর্দ্ধনের জন্য সেইভাবে পাল খাটাইবার আদেশ দান করা।

কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, নাবিক যদি সে সংবাদ না রাখে, তবে কোথায় যাইবে, তাহার নিরূপণই হইতে পারে না। অর্ণবপোত এখন কিছু আর কোন সংকীর্ণ নদীর ভিতরে—বাণিজ্য-বহুল কোন নগরীর ক্রোড়ে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে। সে সকল শৃঙ্খল খুলিয়া উন্মুক্ত মহা-সমুদ্রে ভাসিতেছে। আপনার স্থান নিরূপণ করিয়া তবে তাহাকে গন্তব্য-স্থানের দিকে ছুটিতে হইবে।

আমাদের যে এই ক্ষুদ্র দেহতরী, তাহা এতদিন কালপরম্পরাগত বিশেষ ভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এক্ষণে নবালোকের তরঙ্গ তাহার গাত্র দিয়া বহিয়া যাইতেছে, নবভাবের প্রবাহ তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। নূতন চিন্তা নবসাধনা তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। আত্ম-জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ এবং কোন দিকেই বা যাত্রা করিবে।

মনুষ্যের এমন অনেক অবস্থা আসিয়া পড়ে, যখন সে কার্য্য করিতেছে, অথচ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কার্য্য করিতেছে। তখন উদ্দেশ্যের সহিত কার্য্যকে মিলিত করিয়া দেওয়াই অপরের কর্ত্তব্য। হিন্দু-সমাজের ভিতরে থাকিয়া আহার-বিহারে অন্ধভাবে এমন অনেক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সদুত্তর দিতে পারি না। সেই জন্য আত্মজিজ্ঞাসা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্ধ ও মৃতভাবে কার্য্য করিবার জন্য মানবাত্মার এখানে জন্ম হয় নাই। সকল কার্য্য তাহাকে বিচারের সহিত সজ্ঞানে ও জাগ্রত-ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই খানেই মনুষ্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠতা।

পরব্রহ্মের উপাসক হইয়াছ। সাধনমার্গ হয় ত সহজ মনে কর। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহার সাধনার প্রকৃত পন্থা কি জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত অনেক সময়ে সদুত্তর দিতে পারিবে না। কিন্তু এই খানেই তোমার আত্ম-সংস্থান নিরূপণ প্রয়োজন। যদি অসমর্থ হও, কেন ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া মিলিত হইয়াছ, কোন্ মুখে যাইবে যদি তাহার সদুত্তর দিতে না পার, তবে ভ্রান্ত নাবিকের ন্যায় তোমারও যাত্রা উদ্দেশ্য বিহীন, দিগ্‌বিদিগ্ শূন্য; তোমার ব্রহ্মপূজা শূন্যপূজার নামান্তর মাত্র।

প্রতি সপ্তাহে যে বৈদিক মন্ত্রে এখানে বসিয়া পূজা কর, তাহারই ভিতরে সকল সন্ধান পরিস্ফুট ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখ না, তাই হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। আমরা অগ্নির উপাসক নহি, কিন্তু "যোদেবোঽগ্নৌ" যিনি অগ্নির ভিতরে রহিয়াছেন, আমরা জলের উপাসক নহি, কিন্তু যিনি জলে রহিয়াছেন, সুশীতল বারি যাঁহার স্নেহ-ধারা, আমরা জড়োপাসক নহি, কিন্তু যিনি বিশ্বভুবনে বিরাজমান "যঃ বিশ্বভুবনং অবিবেশ" অথচ তাহা হইতেও অতিরিক্ত, ওষধি-বনস্পতির যিনি প্রাণ, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। তাই বলিয়া তিনি কি মরণশীল প্রাণ, তাহা নহে, তিনি সত্যং। সে প্রাণের বিনাশ নাই। তিনি কি অন্ধ শক্তি, তাহা নহে তিনি জ্ঞানং। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান-শক্তির কথঞ্চিৎ বিকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের আবর্ত্তনে। পশু পক্ষীর কলরব, কীটাণু হইতে উন্নততম জীবের যে উদ্দাম নৃত্য-বিহার, তাহাদের আনন্দ-প্রবাহের মূল নির্ঝর কোথায় না তাঁহাতে, মানবাত্মার প্রেমানন্দের আকর কে, না তিনি। তবে তিনি কি কেবল দূরদূরান্তরে—অগ্নি বায়ু বিশ্বভুবন ঔষধি বনস্পতির অন্তরালে সঙ্গো-

পনে স্থিতি করিবেন; আমাদিগকে দর্শন দিবেন না। তাঁহার সঙ্গে আমাদের কি কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই? তিনি কি জড়-বস্তুর অন্তরালে বিরাজিত থাকিবেন? আমাদের সঙ্গে তাঁহার কি গাঢ়তর যোগ নাই? বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে না। উপাসনার মন্ত্রের ভিতরেই দেখিবে "পিতা নোঽসি" তিনি আমাদের পিতা, সবিতা, মাতা সকলই। যখন পিতা বলিয়া তাঁহাকে প্রতীতি করি তখন বুঝিতে পারি ধর্ম্মরাজ্যের শিক্ষক ও রাজা তিনি উভয়ই। যখন মাতা বলিয়া তাঁহাকে দর্শন করি, তখন জানিতে পারি, অপার তাঁহার প্রেম ও করুণা। আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানগণের জন্য তিনি তাঁহার সকরুণ-বাহু বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

তুমি কে, এখন কোথায় আসিয়াছ, বুঝিতে পারিলে। তুমি আর অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির উপাসক নহ। কিন্তু তাহাদের অন্তর্যামী বিধাতার পুত্র, সেবক ও উপাসক। কোথায় যাইবে? ব্রহ্মই তোমাদের গম্যস্থল, তিনিই তোমার পিতা মাতা বন্ধু সকলই; তিনিই তোমার শান্তি নিকেতন।

অতএব সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষণ্ণ হইও না। পরমপিতার কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন কর। "সমনস্কঃ সদা শুচিঃ" সমনস্ক ও পবিত্র হও। দেখিও যেন চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়। পাপতাপের বন্ধন ছেদন করিয়া, সংসারের মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অগ্রসর হও। তাঁহার করুণা-সমীরণ—তাঁহার প্রেমাশীর্ব্বাদের মলয়হিল্লোল অবশ্যই তোমাকে ব্রহ্মধামে উপনীত করিবে। তিনি যতদিন এখানে রাখেন, নির্লিপ্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর। মুগ্ধ হইলে চলিবে না। জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা বিপথে পতন অবশ্যম্ভাবী। নিয়তকাল তাঁহার নিকট অনুকূল বায়ু ভিক্ষা কর, সেই ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া থাক, এ ভাবে জীবন তরিকে চালাইতে পারিলে অচিরেই দূর হইতে ব্রহ্মধামের আভাস দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে বলিবে "ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম, অপূর্ব্ব শোভন, ভবজলধির পারে, জ্যোতির্ম্ময়" এবং সংসার-বন্ধু সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিতে পারিবে "শোক তাপিত জন সবে চল সকল দুঃখ হবে মোচন।"

সেখ সাদি।

প্রজার সহিত সদ্ব্যবহার কর যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে। বিপদের সময় প্রজাগণই তোমার সৈন্য হইয়া দাঁড়াইবে।

একজন দুর্দ্দান্ত রাজা জনৈক সাধুকে তাঁহার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে, সাধু কহিলেন, হে ভগবন্! এই রাজাকে বিনাশ কর। রাজা বলিলেন, এই কি আমার হিতের জন্য প্রার্থনা? সাধু উত্তরে জানাইলেন, আপনার ও আপনার প্রজাগণের জন্য ইহা অপেক্ষা কল্যাণতর প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? কিসের জন্য আপনি রাজা? অত্যাচার করিবার জন্য নহে; মৃত্যুই আপনার শ্রেয়স্কর।

একজন সাধুকে কোন অত্যাচারী রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার পক্ষে কল্যাণকর কি? সাধু বলিলেন, দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া। আপনি অত্যাচার করিবার যত অল্প অবসর পান, ততই ভাল। হায়! জাগরণ অপেক্ষা নিদ্রা যাহার বাঞ্ছনীয়, মৃত্যুই কি তাহার পরম কল্যাণকর নহে?

বিষয় কার্য্য করিতে গিয়া নিষ্কলঙ্ক থাকিলে তোমার ভয় কি? রজকেরা মলিন বস্ত্রকেই প্রস্তরের উপর আছড়াইয়া থাকে।

বাণিজ্যের কারণ সমুদ্রযাত্রায় লাভের বিশেষ সম্ভাবনা থাকিলেও সমুদ্র বিপদ-সঙ্কুল। যাহারা কেবলমাত্র নিরাপদ থাকিতে চায়, উপকূল তাহাদেরই জন্য।

সম্পদের সময় আনুগত্যে নহে কিন্তু বিপদের সময় উদ্ধার করিবার জন্য হস্ত প্রসারণেই প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয়।

বিপদে হতাশ হইও না, ঈশ্বরের লুক্কায়িত দয়া যে কোন্ সময়ে তোমাতে প্রকাশ পাইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বিপদের সময় লোকে পদদ্বয় দিয়া বিপন্নের গলদেশ চাপিতে যায়; কিন্তু সম্পৎকালে লোকের মুখে তাহার প্রশংসা ধরে না।

রাজার সেবা কর, প্রভূত অর্থাগম হইবে, কিন্তু বিপদও অবশ্যম্ভাবী। প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমুদ্রগামী বণিক নিজ দেশের উপকূলে ফিরিয়া আইসে, কিন্তু তরঙ্গাঘাতে অনেকেরই জীবন ও ধন বিনষ্ট হয়।

সাধুলোকের পরামর্শ তুচ্ছ করিতেছ; লৌহশৃঙ্খল পরিধান করিবার তোমার আর বড় বিলম্ব নাই। সর্পগর্ত্তে অঙ্গুলি দিতেছ; হায়! তাহার দংশন সহ্য করিবার তোমার শক্তি কোথায়?

যদি সুনাম অর্জ্জন করিবার বাসনা থাকে, দানশীল হও। ঈশ্বর তোমাকে প্রভূত সম্পত্তির অধীশ্বর করিয়াছেন এই জন্য যে তুমি ভোগ করিবে ও দান করিবে; তিনি তোমাকে ধনের প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখেন নাই, যে কেবলই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিবে।

প্রজার বৃক্ষ হইতে রাজা একটিমাত্র ফল গ্রহণ করিতে চাহিলে তাঁহার ভৃত্যগণ বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলে। রাজা প্রজার নিকট হইতে চারিটি ডিম্ব লইবার আদেশ দিলে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ প্রজার সহস্র গৃহপালিত পক্ষী বিলুণ্ঠন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

যদি ঈশ্বরের দয়া পাইতে চাও, অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। অন্যায় করিয়া অপরের হৃদয়ে ব্যথা দিও না, তাহার একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে তোমার সমস্তই জ্বলিয়া যাইবে।

উজির রাজাকে যেরূপ ভয় করে, ঈশ্বরকে সেইরূপ ভয় করিলে সে নিশ্চয়ই স্বর্গদূত হইতে পারিত।

মরুভূমির উপর প্রবল বাত্যার ন্যায় মনুষ্য জীবন শীঘ্রই চলিয়া যায়। শোক দুঃখ সৌন্দর্য্য মলিনতা সবই যায়, কিছুই থাকে না। অত্যাচারী মনে করিতে পারে যে অপরকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু হায়, সে পাপ অত্যাচারীর কণ্ঠে দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে।

রাজার অভিমতের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করা বড়ই বিপৎ-সঙ্কুল। রাজা যদি দিনকে রাত্রি বলেন, আমাকেও বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, তাইত সত্যসত্যই যে চন্দ্র ও সপ্তর্ষি মণ্ডল দেখিতেছি।

একজন অপরের নিন্দাবাদ করিয়াছিল, তাহাতে সে বলিল ভাই, তুমি আমার যে সকল দোষের কথা বলিতেছ, আমার দোষের মাত্রা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর। আমার দোষ আমি যতটা বুঝিতে পারিতেছি, তুমি ততটা অনুভব করিতে পার নাই।

দাসত্বে প্রাচুর্য্য উপভোগ করা অপেক্ষা মোটা রুটি খাইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা গৌরবের।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু মৃত হইয়াছে ইহাতে কি আনন্দ করিব? আমি ত চিরজীবী নহি। আমাকেও যাইতে হইবে।

প্রভুত্ব ও সৌভাগ্য অনেক সময়ে বিদ্যার উপর নির্ভর করে না।

নানা কথা।

সারনাথ।—বারাণসী হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে সারনাথের মন্দির আছে। নিকটে উচ্চ ভূমি, ইষ্টক প্রস্তরে পরিপূর্ণ। ঐ সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ৫ ফুট নিম্নে যে ছাদহীন গৃহাদি বাহির হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যের সুন্দর আভাস রহিয়াছে। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোকে চারিদিক ভাস্বর হইয়াছিল, সেই দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে সারনাথ বৌদ্ধ-বিহারের পত্তন অনুমিত হয়। অনেকগুলি স্তূপ, প্রস্তর-স্তম্ভ, পাষাণের সুন্দর ও মসৃণ মূর্ত্তি, ছত্র ও প্রকোষ্ঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে আরও বাহির হইবে। প্রস্তরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র সরোবরের পরিচয় মিলে। কথিত আছে এইখানে বুদ্ধদেব স্নান করিয়াছিলেন। একটি সুবৃহৎ ভগ্ন স্তম্ভ-গাত্রে সম্ভবতঃ কয়েকটি অনুশাসন খোদিত আছে। যেখানে খনন কার্য্য চলিতেছে তাহার মোট পরিমাণ প্রায় ১৫।২০ বিঘা হইবে। উহাকে বেষ্টন করিয়া যে জলপ্রণালী প্রবাহিত ছিল, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার এক অংশে আধুনিক জৈন মন্দির স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। উহার পূর্ব্ব উত্তরে উচ্চ ও অতি স্থূল ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ গাত্রে প্রস্তরের যে খোদাই কার্য্য রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। মৃত্তিকার ভিতর হইতে গৃহাদি যে বাহির হইতেছে তাহার সৌন্দর্য্য ও নিপুণতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। সমস্ত মৃত্তিকা অপসারিত হইলে সুদূর অতীতের যে কত মুকদালী বাহির হইয়া পড়িবে তাহা কে বলিবে? গবর্ণমেণ্ট আবিষ্কার ও রক্ষাকল্পে অর্থব্যয় করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কাশীযাত্রীগণকে আমরা সারনাথ দেখিয়া আসিবার অনুরোধ করি।

শিল্প-বিদ্যা।—হিন্দুরাজত্ব সময়ে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে হিন্দুগণ বিশেষ নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিলেও মোগলবাদসাহগণের সময়ে এ বিদ্যা যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, অলৌকিক সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাহারা উহাকে স্থায়ী করিবার কূট সন্ধান পাইয়াছিল এবং গৃহাদি গঠনের মৌলিকতায় যে তাহারা আমাদের বিস্ময়কে জাগাইয়া তুলিবার যে উপাদান ও অনুপম কৌশল বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের উন্মুক্ত চত্বরে দাঁড়াইয়া মসজিদের গগনস্পর্শী খিলান ও উপরের স্তম্ভদ্বয় নিরীক্ষণ কর, সত্যসত্যই মনে হইবে যেন তাহারা আকাশের দিকে অনন্ত ঈশ্বরের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। হুমায়ুন ও আকবরের সমাধি-ভবন, সাহজাহান বিনির্ম্মিত তাজবিবির অক্ষয় স্মৃতিমন্দির সন্দর্শন কর, চারিদিকে কি প্রকাণ্ড চত্বর ও উদ্যান, তাহারা যেন গুরু গম্ভীর ভাবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। সমাধি-মন্দিরের এত সৌন্দর্য্য! কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের ভিতরে বিলাস নাই, চাঞ্চল্য নাই। রক্ত প্রস্তর এবং দুগ্ধধবল মর্ম্মরের ভিতর হইতে বিষাদের ছায়া বাহির হইতেছে। কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে নীরবে নিঃশব্দে তাহার উপর দিয়া পদসঞ্চার করিতে হয়, মৃতের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়। দিল্লী আগরার প্রাচীন দুর্গের মধ্যে প্রবেশ কর। তাহার ভিতরকার মর্ম্মর-প্রাসাদ মতি-মসজিদের অবাক্ত সৌন্দর্য্য এখনও তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু সকলই শূন্য। ইংরাজরাজ সভ্যজাতিগত সম্ভ্রমের সহিত তৎসমস্ত রক্ষা করিতেছেন। আগরার দুর্গমধ্যস্থ যোধবাই-ভবন মোগল বাদসাহগণের রাজপুত জাতির সহিত মিলন-চেষ্টা ঘোষণা করিতেছে, কি করিয়া মর্য্যাদাদানে বিজিতকে আপনার করিয়া লইতে হয় তাহার অব্যক্ত সাক্ষী প্রদান করিতেছে। ভাস্করের তাড়নে কঠিন মর্ম্মরও যে কমনীয়তা লাভ করিতে পারে এবং তাহার গাত্রে যে প্রফুল্লিত কুসুম লতাপত্রসহ বিকশিত হইতে পারে, যদি কেহ দেখিতে চান তবে মোগল কীর্ত্তি দর্শন করুন। ২০০ বৎসর হইল মোগল শক্তি নির্ব্বাপিত, কিন্তু তাহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বসংহারক কালের প্রভাবকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।—শ্রীযুক্ত সেখ জমির-দ্দীন সাহেব নদিয়া জেলার অন্তর্গত গাঁড়াডোব হইতে লিখিয়াছেন, ১৮৯৪ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে আমার স্বদেশী ও ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পার্কষ্ট্রীটে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। পরিচয় হইলে তিনি আমাকে বলিলেন;—"যে সমাজেই থাক, ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভক্তি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন কর। তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর ও তাঁহার আরাধনা কর; তাহা হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। যাকে

কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলে, তিনি যেমন সন্তানকে কোলে তুলিয়া লন, তদ্রূপ ব্যাকুল অন্তরে পরম মাতাকে ডাক, তিনিও তোমাকে অচিরে সস্নেহে গ্রহণ করিবেন।" পরে ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দান করুন এই আশীর্ব্বাদ করিয়া সে দিন আমাকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর ১৩০১ সালের ২২শে মাঘ সোমবার ৯টার সময়ে তাঁহার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিতে গেলে বলিলেন ;—"যো সারা মুলুকো কা মালেক হাঁয়, হাঁম উন্‌কা পরস্তিশ করতা হঁ।" "যিনি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, আমি তাঁহার উপাসনা করি। এই ভূমা মহাপুরুষে সকলের সমান অধিকার।" এই উপদেশ দিতে দিতে তিনি একেশ্বরের ভাবে এমনি নিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।

১৩১০ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাতঃকালে মহর্ষির সহিত তৃতীয় বার সাক্ষাৎ করি। এইবার তিনি বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। অধিক কথা হইল না। হায়! কে জানিত যে এই তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা। তিনি বলিলেন আমিত চলিলুং। "তোমাকে আমি অতি আহ্লাদের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" দিতেছি, যত্নের সহিত প্রতিমাসে পাঠ করিও, অনেক শিক্ষা মিলিবে।"

হায়! জীবনে এইরূপ সাধু সজ্জনের সাক্ষাৎ ভাগ্যক্রমে মিলিয়া থাকে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, আশ্বিন মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৩২৸৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৩৪৷ ৩
সমষ্টি	...	৩৩৬৭৶৬
ব্যয়	...	৬৮০॥/৯
স্থিত	...	২৬৮৬॥/৯

আছে।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
হুন্ন কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২৮৬॥/৯

২৬৮৬॥/৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ২১৪৸৶৩

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন শির হইতে উঠাইয়া লইয়া ব্রাহ্মসমাজে জমা দেওয়া যায়

৩৸৶৩

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র

১৲

২১৪৸৶৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১৬ ৶০
যন্ত্রালয়	...	৩০১৸৶০
সমষ্টি	...	৬৩২৸৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৪১৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৭ ৶৩
পুস্তকালয়	...	।৶৬
যন্ত্রালয়	...	২৪৭৷/৬
গচ্ছিত	...	৮৸৶৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৩৸৶৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১ ৫৩
সমষ্টি	...	৬৮০॥/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
প্রথমভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৮।

৭৭৩ সংখ্যা। ১৮২৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বরপ্রেম।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে অন্তরতম পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়তর।

তাঁর প্রেম ত আমাদের উপর অজস্র বর্ষিত হইতেছে, আমরা কি সেই প্রেমের প্রতিদান করিব না? যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই তাঁহার করুণা, তাঁহার প্রেমের পরিচয়। বারিসাগরে জলচরের ন্যায়, এবং বায়ুসাগরে প্রাণীমাত্রের ন্যায় আমরা তাঁহার প্রেমসাগরে নিমজ্জিত রহিয়াছি। আমাদের জন্মে তাঁহার প্রেমের পরিচয়, বৃদ্ধিতে তাঁহার প্রেম, এবং মৃত্যুতে তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাইতেছি। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে সেই করুণাময়ের হস্ত মুদ্রিত রহিয়াছে। সুখের দিনে, আনন্দের দিনে তাঁহার করুণা ত দেখিয়াইছি—আবার যখন দুঃখ শোকের দংশনে ক্লিষ্ট হই তখন সেই দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়াও তাঁহার করুণার পরিচয় বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিচিত্র ঘটনাবলির মধ্যে তাঁহার অযাচিত করুণা, তাঁহার অজস্র প্রেমধারা দেখিয়া চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হয়। "যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে তারেও করিছেন প্রেম দান।" আমরা কি এই প্রেমের প্রতিদান করিব না? কিরূপে ইহার প্রতিদান করিব? কোন্ পদার্থ দিয়া? আমাদের প্রেমই তার প্রতিদান। তিনি আমাদের নিকট হইতে আর কিছু চাহেন না—তিনি আমাদের প্রীতি চাহেন। তুমি ক্ষুদ্র, তুমি পাপী, তুমি অপরাধী, তবু তিনি ত তোমাকে ছাড়িতেছেন না, তুমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে যাইবে? ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমিও ব্রহ্মকে যেন পরিত্যাগ না করি—তিনি আমা কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের হৃদয়ে এই প্রেম প্রদীপ্ত হয় তাঁহার জীবনে আনন্দ,

মরণে অভয়। এই সংসারে কত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি, দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক, পাপ তাপ রহিয়াছে—এই প্রেম সকল বিঘ্ন দূর করে, দুঃখ কষ্ট প্রশমন করে, শোকের অশ্রু মার্জ্জনা করে, পাপ তাপ হরণ করে। এই স্বর্গীয় প্রেমে আমাদের পার্থিব বস্তুর প্রতি প্রেম কি আচ্ছন্ন বা ম্লান হয়? না, ইন্ধন পাইয়া তাহা আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের উপর পড়িয়া যেমন চাঁদের কমনীয় কান্তি প্রসব করে সেইরূপ ঈশ্বর প্রেমের আভায় পার্থিব প্রেম আরো উজ্জ্বল সুন্দর হয়। জননীর স্নেহ, সন্তানের ভক্তি ও ভালবাসা, সতীর প্রেম—সেই স্বর্গীয় প্রেমে রঞ্জিত হইয়া নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই প্রেম কি আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিঘ্ন-কারী? না, তাহা নহে। সেই প্রেম আমাদের সকল সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক—আমাদের তাবৎ পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহদাতা। প্রেমবলে আমরা প্রেয়ের কুহক মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যের আদেশ পালন করিতে অসীম বল ও সাহস পাই। যদি বা মোহবশতঃ কখন বিপথে পদার্পণ করি সেই প্রেম-কাণ্ডারীর আশ্রয়ে আবার সৎ-পথে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। ভাগীরথী যেমন হিমালয় হইতে স্যন্দমান হইয়া বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা ও ধন ধান্যে পূর্ণ করে, আমাদের প্রীতি সেইরূপ ঈশ্বর হইতে সংসারক্ষেত্রকে সারবান্ ও ফলবান্ করত ভিন্ন ভিন্ন মার্গে প্রবাহিত হয়।

মৃত্যু কি সেই প্রেমকে হরণ করিতে পারে? না, তাহা নহে। সেই প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়। সংসারের আর যে কোন বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন কর না কেন, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে তোমার যে প্রিয় সে তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে; হয় সে তোমা হইতে নয় ত তুমি তাহা হইতে বি-যুক্ত হইবে—কিন্তু সেই যে স্বর্গীয় প্রেম তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। যখন আর সকলেই চলিয়া যাইবে তখন সেই প্রেম তোমার সঙ্গের সঙ্গীএবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া সেই প্রেমময়ের সহিত আরো গাঢ়তর রূপে সম্মিলন করাইয়া দিবে।

তৃতীয় খণ্ড।

সত্য সুন্দর মঙ্গল।

মঙ্গল।

আমাদের সত্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইয়া এক্ষণে যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, অধ্যাত্মবিদ্যা, ন্যায়, তত্ত্ববিদ্যা সেই জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরের ধারণা হইতে রস-শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং মঙ্গলের ধারণা হইতে সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের উৎপত্তি।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে যে নৈতিক ধারণা বদ্ধ তাহা মিথ্যা ও সং-কীর্ণ। যে রূপ ব্যক্তিগত নীতি আছে, সেইরূপ সার্ব্বজনিক নীতিও আছে। মানুষে মানুষে যে সাধারণ সম্বন্ধ, সেত আছেই, তা ছাড়া এক নগরের লোক—এক রাষ্ট্রের লোক বলিয়া পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সকল সম্বন্ধও সার্ব্বজনিক নীতির অন্তর্ভূত। মঙ্গলের ভাব যেখানে লেশ-মাত্র আছে, সেইখানেই নীতির অধিকার। রাষ্ট্রিক জীবনের রঙ্গভূমিতে, এই মঙ্গলের ধারণা, ন্যায় অন্যায়ের ধারণা, সুকৃতি দুষ্কৃতির ধারণা, বীরত্ব দুর্ব্বলতার ধারণা, যেরূপ অনাবৃতভাবে ও বলবৎরূপে প্রকাশ

পায়, এমন আর কোথায় ? নীতির উপর— এমন কি, ব্যক্তিগত নীতির উপর,—লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, ও রাষ্ট্রপ্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার যে প্রভাব সেরূপ প্রভাব আর কোথায় লক্ষিত হয় ? যদি মঙ্গলের সীমা অতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে মঙ্গলকে ততদূর পর্য্যন্তই অনুসরণ করিতে হইবে। সুন্দরের ধারণা যেরূপ আমাদিগকে কলা-রাজ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, মঙ্গলের ধারণা সেইরূপ আমাদিগকে রাষ্ট্রিক জীবনের কার্য্যক্ষেত্রেও আনিয়া ফেলিবে। দর্শনশাস্ত্র কোন অপরিচিত নূতন শক্তিকে জোর করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করে না, পরন্তু মানব-প্রকৃতির যে সকল মহতী অভিব্যক্তি দর্শনশাস্ত্র সেই সকল অভিব্যক্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে না। যে দর্শনশাস্ত্র নীতি-তত্ত্বে পর্য্যবসিত না হয় তাহা দর্শন নামের যোগ্য কি না সন্দেহ; এবং যে নীতি অন্ততঃ সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ তত্ত্বে উপনীত না হয়, সে নীতি নিতান্তই শক্তিহীন, মানবের দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদে সে নীতি কোন সুপরামর্শ দিতে পারে না, কোন নিয়মের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

একথা মনে হইতে পারে—ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে তত্ত্ববিদ্যা ও যে রসতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছি তাহা হইতেই নীতি-সমস্যার মীমাংসা আপনা-আপনি হইয়া যাইবে—কোন্‌টি নীতি, কোন্‌টি নীতি নহে, সহজেই নির্দ্ধারিত হইবে।

মনে হইতে পারে—আমরা যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছি, তাহার দ্বারা মঙ্গলের এই দূর-পরিণাম-স্পর্শী ও বৃহৎ সমস্যাটি পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার মীমাংসা হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের সত্যসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ও সুন্দরসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হইতেই, স্বাভাবিক যুক্তিপরম্পরাক্রমেই আমরা নীতিসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব; হয়ত পারিব কিন্তু আমরা তাহা করিব না। তাহা হইলে, আমরা এ পর্য্যন্ত যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই প্রণালী প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের উপর স্থাপিত, কোন স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির উপর স্থাপিত নহে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরামর্শ অনুসারে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। পরীক্ষাকার্য্যে যেন আমরা ক্লান্তি বোধ না করি; আধ্যাত্মবিদ্যার প্রণালী যেন আমরা যথাযথরূপে অনুসরণ করি। উহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটে, পুনরাবৃত্তি হয়, এ সমস্তই সত্য; কিন্তু উহা আমাদিগকে সমস্ত বাস্তবতার—সমস্ত জ্ঞানালোকের মূলে লইয়া যায়।

অধ্যাত্মবিদ্যার অনুমোদিত প্রণালীর মূলসূত্রটি এই :—প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র, উদ্ভাবন করে না, উহা নির্দ্ধারণ করে ;—যে জিনিসটি যাহা, তাহারই বর্ণনা করে। এস্থলে জিনসটি কি,—না, মানুষের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাস। অতএব মঙ্গল-সম্বন্ধে, মানুষের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসটি কি —আমাদের নিকট ইহাই প্রধান সমস্যা।

এক দিক্ দিয়া মানবজাতি এবং অপর দিক্ দিয়া দর্শনশাস্ত্র যাত্রা আরম্ভ করে—এ কথা আমরা বলি না। দর্শনশাস্ত্র মানবজাতির ব্যাখ্যাকর্ত্তা। মানবজাতি যাহা কিছু বিশ্বাস করে ও চিন্তা করে (অনেক সময়ে আপনার অজ্ঞাতসারে) দর্শনশাস্ত্র তাহাই সঙ্কলন করে, ব্যাখ্যা করে, স্থাপনা করে। উহা সমগ্র মানব-প্রকৃতির যথাযথ ও পূর্ণ অভিব্যক্তি। যে মানব-প্রকৃতি প্রত্যেকের

অন্তরে বিদ্যমান, তাহা প্রত্যেকেরই অহং-জ্ঞানে উপলব্ধি হয়; এবং যে মানব-প্রকৃতি অন্যের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা অন্যের বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ পায়। উভয়কেই জিজ্ঞাসা করা যাক্, বিশেষতঃ আমাদের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্; সমস্ত মানবজাতি কি চিন্তা করে, অনুসন্ধান করিয়া জানা যাক্। তাহার পর আমরা দেখিব দর্শনের প্রকৃত কাজ কি।

এমন কোন জাতি কি আমাদের জানা আছে যাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, ন্যায় অন্যায়—এই সকলের প্রতিশব্দ নাই? এমন কোন ভাষা কি আছে, যাহাতে, সুখ, স্বার্থ, প্রয়োজন, হিত—এই সকল শব্দের পাশাপাশি—স্বার্থবিসর্জ্জন, নিঃস্বার্থভাব, ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠা—এই সকল শব্দ লক্ষিত হয় না। প্রত্যেক ভাষার ন্যায় প্রত্যেক জাতিও কি স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য ও স্বত্বাধিকারের কথা বলে না?

এইখানে বোধ হয়, কঁদিযাক্ ও হেল্‌ভেস্যসের কোন শিষ্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—পর্য্যটকেরা সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে যে সকল অসভ্য জাতি দেখিয়াছেন, তাহাদের ভাষার কোন প্রামাণিক অভিধান আমার নিকট আছে কি না?—না, আমার নিকট নাই; কিন্তু আমরা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের উপধর্ম্ম ও কুসংস্কার লইয়া আমাদের দার্শনিক ধর্ম্মমত গঠন করি নাই; কোন দ্বীপবাসী অসভ্যজাতির মানব-প্রকৃতি অনুশীলন করা আবশ্যক, ইহা আমরা একেবারেই অস্বীকার করি। অসভ্যদিগের অবস্থা—মানবজাতির শৈশবাবস্থা, মানবজাতির বীজাবস্থা, উহা মানবজাতির পরিণত অবস্থা নহে। মানবজাতির মধ্যে যে মনুষ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃত মনুষ্য। যেমন, যে মানব-সমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত মানব-সমাজ, সেইরূপ যে মানব-প্রকৃতি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত মানব-প্রকৃতি। অ্যাপলো বেল্‌ভিডিয়ার সম্বন্ধে কোন অসভ্য মনুষ্যের মতামত কি, তাহা আমরা জানিবার জন্য লালায়িত হই না। কি কি মূলতত্ত্ব লইয়া মানবের নৈতিক প্রকৃতি গঠিত তাহাও আমরা অসভ্য মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করি না। কেন না, অসভ্য মনুষ্যের নৈতিক প্রকৃতির সবেমাত্র রেখাপাত হইয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। আমাদের সপ্তদশ শতাব্দির বিপুল দর্শনশাস্ত্র অনেকস্থলে বিবিধ সিদ্ধান্তের অবতারণায় একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে ঈশ্বরই কর্ম্ম-রঙ্গভূমির প্রধান নায়ক, তাহাতে মনুষ্যের স্বাধীনতা একেবারে বিদলিত হইয়াছে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দির দর্শনশাস্ত্র ঠিক্ তাহার বিপরীত সীমায় উপনীত। উহা অন্য ধরণের সিদ্ধান্ত সকল অবলম্বন করিয়াছে; তাহার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এই;—আদিম মানবের স্বাভাবিক অবস্থা হইতেই এখনকার সমস্ত মনুষ্যসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য রুসো অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর—দেখিবে, এই স্বাভাবিক অবস্থার মতপ্রচারক, এক দিকের আতিশয্যে চালিত হইয়া বিপরীত দিকের আতিশয্যে উপনীত হইয়াছেন; বন্য স্বাধীনতার মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে, তিনি ল্যাসিডেমোনিয়া-প্রচলিত সামাজিক চুক্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আবার কঁডিয়াক একটি প্রতিমূর্ত্তিতে কি করিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় ক্রমেক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল তাহাই কল্পনা করিয়া দেখাই-

য়াছেন। প্রতিমূর্ত্তিটি, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরে পরে লাভ করিল, কিন্তু একটা জিনিস লাভ করিল না—সে জিনিসটা মনুষ্যের মন—মনুষ্যের আত্মা। ইহাই তখনকার পরীক্ষা পদ্ধতি। এই সকল আনুমানিক সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দেও। সত্যকে জানিবার জন্য সত্যের অনুশীলন আবশ্যক—শুধু কল্পনা করিলে চলিবে না। পরিণত মনুষ্যের বাস্তবিক লক্ষণ ও অবস্থা এখন যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বন্য অবস্থার—আদিম অবস্থার মনুষ্যের কিরূপ প্রকৃতি ও লক্ষণ ছিল, তাহা শুধু অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। অবশ্য বন্যদিগের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যের নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই শৈশব-অন্ধকারের মধ্যেও দুই একটা বিদ্যুচ্ছটা প্রকাশ পায়, এখনকার ন্যায় উচ্চতর ধর্ম্মবৃত্তির নিদর্শন উপলব্ধি হয়—পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে ইহা আমরা দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার এ স্থান নহে। কিন্তু যাহাতে আমরা প্রকৃত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যথাযথরূপে অনুসরণ করিতে পারি, এই জন্য শিশু ও বন্য মনুষ্য হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া একটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব—সেই বিষয়টি বর্ত্তমানকালের মনুষ্য, প্রকৃত মনুষ্য, পূর্ণবিকশিত মনুষ্য।

এমন কোন ভাষা কিংবা জাতি কি দেখাইতে পার যাহার মধ্যে "নিঃস্বার্থভাব" এই কথাটি নাই? লোকে কাহাকে সাধু ব্যক্তি বলে? যে বিষয়কর্ম্মে খুব দক্ষ ও হিসাবী তাহাকে, না যে আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধেও ন্যায়ধর্ম্ম পালন করিতে সতত ইচ্ছুক—তাহাকে? নিজ স্বার্থের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে লোক-মত ও সুখ-সুবিধার বিরুদ্ধেও কতকটা ত্যাগস্বীকার করিতে সমর্থ—এই ভাবটি যদি কোন সাধু ব্যক্তির চরিত্র হইতে উঠাইয়া লও, তাহা হইলে তাহার সাধুতার মুলোচ্ছেদ করা হয়। যাহাতে আমার নিজের সুখ হয়, যাহা কিছু আমার নিজের কাজে লাগে তাহাই আমার বরণীয়—এইরূপ মনের প্রবৃত্তি যে পরিমাণে কম কিংবা বেশী হয়, ক্ষীণ কিংবা প্রবল হয়, অল্প কিংবা অধিক স্থায়ী হয়, সেই অনুসারে সাধুতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। খুব সামান্য অবস্থার লোকই হউক, কিংবা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয়ের পাত্রই হউক, যদি কোন ব্যক্তির নিঃস্বার্থভাব, আত্মোৎসর্গের সীমায় উপনীত হয় তবেই তাহাকে আমরা বীরপুরুষ বলিয়া থাকি। দুই প্রকার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখা যায়—এক প্রকার আত্মোৎসর্গ অপ্রকাশ্য, আর এক প্রকার আত্মোৎসর্গ জ্বলন্ত-ভাবে জগজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রণক্ষেত্রে কিংবা রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাসভায় সাহস ও দেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি যেমন বীরপুরুষ নামে অভিহিত হয়, সামান্য জীবন ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, অসাধারণ ঋজুতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, তাহাকেও আমরা বীর নামে আখ্যাত করি। সকল ভাষাতেই এই সকল শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সুপরিচিত; এবং ইহা হইতেই এই তথ্যের সার্ব্বভৌমতা সুনিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয়। এই তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এক বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক;—ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেন আমরা ইহার মুলোচ্ছেদ না করি। স্বার্থপরতাই নিঃস্বার্থপরতার মূল—এই বলিয়া কি আমরা এই নিঃস্বার্থভাবের ব্যাখ্যা করিব? লোকের সহজ জ্ঞান একথায় কখনই সায় দিবে না।

কবিদিগের কোন বিশেষ দর্শন-তন্ত্র নাই। মানুষের মনে ভাবোৎপাদন করিবার জন্য, মানুষ এখন যেরূপ—সেই মানুষের প্রতিই তাঁহারা সম্ভাষণ করেন। কবিগণ, সুনিপুণ স্বার্থপরতার—না, নিঃস্বার্থ সাধুভাবের গুণ কীর্ত্তন করেন? মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার সফলতার জন্য—না সাধুতার স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বার্থত্যাগের জন্য তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে প্রশংসা চাহেন? মানব-আত্মার অন্তঃস্তলে নিঃস্বার্থভাবের ও ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার কি এক আশ্চর্য্য প্রভাব আছে—কবি তাহা জানেন। তিনি নিশ্চয় জানেন, হৃদয়ের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটি উত্তেজিত করিলেই মানব-হৃদয়ে একটা গম্ভার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিবে—করুণ-রসের সমস্ত উৎস উৎসারিত হইবে।

মানব-জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন কর, সর্ব্বত্রই দেখিবে, লোকেরা বেশী বেশী স্বাধীনতার জন্য ক্রমাগত দাবী করিতেছে। এমন কি মনুষ্য শব্দটি যত দিনকার, এই স্বাধীনতা শব্দটিও তত দিনকার পুরাতন। কি আশ্চর্য্য! লোকেরা স্বাধীনতা লাভের দাবী করিতেছে আর স্বয়ং মনুষ্য কি না স্বাধীনতার অধিকারী নহে! এই স্বাধীনতা শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সুনির্দ্দিষ্ট। ইহার অর্থ এই,—মানুষের বিশ্বাস,মানুষ শুধু প্রাণবান সচেতন জীব নহে, পরন্তু মানুষের ইচ্ছা আছে—যে ইচ্ছা তাহার নিজের—সুতরাং সে ইচ্ছার উপর অপর কাহারও ইচ্ছা জুলুম করিতে পারে না—অপর কাহারও ইচ্ছা নিয়তির ভাবে—এমন কি শুভ নিয়তির ভাবেও মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। তুমি কি কখন কল্পনা করিতে পার,—আসল জিনিসটা না থাকিলে এই স্বাধীনতা শব্দ ও স্বাধীনতার ভাবটি উৎপন্ন হইতে পারিত? তুমি কি বলিতে চাহ, মানুষের স্বাধীনতা-স্পৃহা শুধু একটা মায়া-বিভ্রমমাত্র। তাহা হইলে বলিতে হয়, মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা-মাত্রই দুর্ব্বোধ্য অতিশয়োক্তি। স্বাধীনতা ও নিয়তির মধ্যে যে মুখ্য প্রভেদ আছে সেই প্রভেদ অস্বীকার করিলে, সকল ভাষার ও সকল জাতিরই প্রতিবাদ করিতে হয়; অবশ্য স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিলে প্রজাপীড়ক রাজাকে নিরপরাধী করা যায়, কিন্তু তেমনি আবার বীরপুরুষকে অবনত ও হীন করিয়া ফেলা হয়। বীরেরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে, সে কি তবে একটা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক ব্যাপার?

(ক্রমশঃ)

বেদ,উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

অথর্ব্ব বেদের মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমে আছে যে মহাশাল শৌনক অঙ্গিরসকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

কাহাকে জানিলে, হে ভগবন্, সকল জানা যায়?

তস্মৈ স হোবাচ।

অঙ্গিরস তাহাকে বলিলেন

"দ্বে বিদ্যে বিদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।"

ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুই—পরা ও অপরা বিদ্যা।

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা—আর সেই পরাবিদ্যা যদ্দ্বারা অক্ষর সত্যস্বরূপকে জানা যায়।

তুমি যে বিদ্যার প্রশ্ন করিতেছ তাহা সেই পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা; ঋক্ যজুঃ সামবেদ ইহারা সকলি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পরাবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন সকলের মূল ব্রহ্ম, তেমনি সকল বিদ্যার মূলীভূত ব্রহ্মবিদ্যা। সেই মূল সত্যকে জানিলে আর সকল সত্যের অর্থবোধ হয়। তাহা না জানিতে পারিলে এই যাহা কিছু সকলি প্রহেলিকা তুল্য।

বেদকে আমরা ত শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করি—অঙ্গিরস অপরা বিদ্যা বলিয়া কেন তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন? তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধ দেখাইতে গেলে বৈদিক উপাসনা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

বেদ আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রের মূল বলিয়া বিদিত, কিন্তু দেখিতে গেলে বৈদিক উপাসনা এখনকার মত কিছুই নহে। বেদে মূর্ত্তিপূজার কোন নিদর্শন নাই। বৈদিক যুগে প্রাকৃতিক দেবতাদিগের উপাসনা প্রচলিত ছিল। বৈদিক সময়ের ঋষিরা কেবল বাহ্য প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতেন। যত দিন পর্য্যন্ত বাহিরেতেই তাঁহাদের মনের অভিনিবেশ ছিল,তত দিন তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে খণ্ডখণ্ড রূপে দেখিয়াই তৃপ্ত হইতেন। তাঁহারা নবীন নেত্রে অগ্নির আভা, সূর্য্যের প্রভা, উষার সৌন্দর্য্য, মেঘের কান্তি দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল ও আশ্চর্য্যে মোহিত হইতেন এবং ঈশ্বরের সেই সকল অদ্ভুত কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করিতেন। অনন্ত ঈশ্বরকে পরিমিত ভাবে সকলেতেই দেখিতেন। অগ্নির অধিদেবতা স্বতন্ত্র, বায়ুর অধিদেবতা স্বতন্ত্র, মেঘের অধিদেবতা স্বতন্ত্র। যেমন রাজপুরুষদিগের এক এক বিষয়ে অধিকার থাকে, তেমনি প্রত্যেক দেবতার এক এক বিষয়ে অধিকার। যিনি তৃষিত ধরাকে জলসিঞ্চন দ্বারা শীতল করেন তাঁহার বায়ু সঞ্চালনের উপর কোন অধিকার নাই, যিনি সমীরণের মধ্যে থাকিয়া সমীরণকে প্রেরণ করেন তাঁহার সমুদ্রের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যিনি সমুদ্রের কোলাহলের মধ্যে বিরাজ করেন, তিনি নদীর লহরীতে ক্রীড়া করেন না। যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি ধনধান্যের নহেন। এই প্রকারে পূর্ব্বকালে তাঁহারা সেই এক ঈশ্বরকে নানা ভাবে পূজা করিতেন; তাঁহারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতা রূপে পরিমিত ভাবে অর্চ্চনা করিতেন। সূর্য্যে চন্দ্রে মেঘে বিদ্যুতে অনলে অনিলে সলিলে সর্ব্বত্রই তাঁহারা দৈবশক্তি, দৈবমহিমা, দৈবসৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেন। দেবতাগণকে তাঁহারা পরম বন্ধু বলিয়া জানিতেন; আর উৎসবের সময়ে, ক্রিয়াকর্ম্মের সময়ে, জয় পরাজয়ের সময়ে, সুখে দুঃখে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিতেন। তাঁহাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে আপন আপন মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন। আনন্দের সময় আনন্দ জানাইতেন, দুঃখের সময় দুঃখ জানাইতেন। তাঁহাদের চক্ষে জল স্থল নভোমণ্ডল অন্তরীক্ষ বিশ্বভুবন দেবতাত্মক ছিল। কখনও সেই দেবতারা যজ্ঞক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্তোতৃবর্গের সহিত একত্রে মধুর হব্য ভক্ষণ করিতেন, কখনও বা তাঁহারা প্রীতি-নিবেদিত দধি-মিশ্রিত সোমরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ধন রত্ন-

দানে পরিতুষ্ট করিতেন। পুত্রের নিমিত্তে, পশুর নিমিত্তে, শত্রুদিগের উপর জয়লাভের নিমিত্তে দেবতাদের নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল। বেদমন্ত্রগুলি প্রাকৃতিক দেবতাদের এই প্রকার স্তুতিগীতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য এখনো তেমনি আছে, সেই শুভ্র বসনা উষা, সেই তরুণ বিভাকর, সেই রতনমণি-খচিত নীলাম্বর তেমনিই রহিয়াছে কিন্তু আমরা অভ্যাসবশতঃ জড়তাবশতঃ এই শোভা সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাতও করি না। প্রকৃতির মোহিনী শক্তি সকল আমাদের চতুর্দ্দিকে সমানভাবে কার্য্য করিতেছে—বসন্তের মলয়ানিল, বর্ষাকালের প্রবল ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ, প্রকৃতির মধুর হাসি, প্রকৃতির উগ্রমূর্ত্তি তেমনিই প্রকাশ পাইতেছে, আমরা দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু আর্য্য ঋষিদের ভাব স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—এই প্রভাবশালী শক্তি সমূহে পরিবৃত হইয়া সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি আশ্চর্য্যোৎফুল্ল নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং নানা ছন্দোবন্দে তাঁহার স্তুতি গান করিয়া আনন্দে উৎসাহে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের নবীন নেত্রে সূর্য্য চন্দ্র বায়ু মেঘ সকলি জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইত। এই সকল দেবতাদিগের তুষ্টির জন্য ঋগ্বেদ হইতে স্তোত্রপাঠ, যজুর্ব্বেদ প্রণীত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং সামবেদের সঙ্গীত দ্বারা ইঁহাদের পূজা করিতেন।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আর এক চিত্র দেখা যায়। আদিম বৈদিক ঋষিগণ ঋজুস্বভাব সরল-হৃদয় প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ—প্রকৃতির আদি কবি ছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের উপাসনা কার্য্য অকৃত্রিম স্তুতি ও তৎসহকারে প্রীতির সহিত দ্রব্য বিশেষ নিবেদন মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হইত। প্রাচীনতর দেবগণের মধ্যে উষা অগ্নি সূর্য্য ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি নৈসর্গিক দেবতাগণই অগ্রগণ্য ও তাঁহাদের স্তুতিমালায় ঋগ্বেদের অধিকাংশই পরিপূর্ণ। ক্রমে পুরাতন বৈদিক দেবতাদের মহিমা অস্তোম্মুখ হইল এবং বৈদিক ক্রিয়াগুলি জটিল কুটিল বহুব্যাপারশালী হইয়া উঠিল। বেদে দেবপ্রীত্যর্থ যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিধি আছে সেই সকল যজ্ঞ কাম-প্রধান হইয়া উঠিল—পুত্রকাম, ধনকাম যশস্কাম স্বর্গকাম প্রভৃতি নানাবিধ ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক ক্রিয়ার পৃথক ফল; তাহার অনুষ্ঠান বিধানে কতপ্রকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হইল। অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে আশানুরূপ ফললাভের ব্যত্যয় হয়, তাহার প্রতিবিধান উদ্দেশে কতপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত নির্ণীত হইল। এই সকল বহু আড়ম্বর পূর্ণ ক্রিয়া কলাপের পরিচালক পুরোহিতের সাহায্য অনিবার্য্য, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ভিন্ন সে সমস্ত সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং ব্রাহ্মণের আধিপত্য হিন্দু সমাজে ক্রমশঃ বিস্তার হইতে লাগিল। যাজন ধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়াদির পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষত রাখিবার জন্য প্রভূত যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন—তদনুসারে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি প্রজার রক্তশোষণকারী ভারি ভারি যজ্ঞ রাজ্যের স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই রূপ যখন বেদের রূপান্তর ঘটিল—যখন সরল সহজ বৈদিক উপাসনা কতকগুলি সারহীন অর্থহীন আড়ম্বর পূর্ণ ক্রিয়া-

কাণ্ডে পরিণত হইল—তখন উপনিষদের ঋষিরা বেদের বিরুদ্ধে গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"

বেদ বেদাঙ্গ সকলি অপরা বিদ্যা, পরা বিদ্যা সেই যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্যস্বরূপকে জানা যায়।

এক সময়ে বৈদিক মত পরমোৎকৃষ্ট ও বেদোক্ত যাগযজ্ঞ নিতান্ত অনুষ্ঠেয় বলিয়া সকলের বোধ ছিল, পরে উপনিষদের সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে তৎকালের জ্ঞানবাদী ঋষিরা বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা ঋক্, যজুঃ, সাম, প্রভৃতি সমুদয় বিদ্যাকে নিকৃষ্ট বিদ্যা, কেবল ব্রহ্ম বিদ্যাকেই পরাবিদ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বেদের মধ্যে সংহিতার পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের শেষভাগ উপনিষদ। উপনিষদ যে সময়ে আবির্ভূত হইল সে সময়কার পরিবর্ত্তন অল্প পরিবর্ত্তন নহে। উপনিষদে বেদ যেমন অপরা বিদ্যা বলিয়া পদচ্যুত হইয়াছে, সেইরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিও জ্ঞানবাদী ঋষিদিগের অনাস্থা। 'জ্ঞানবাদী' এই নামের ভিতরে এক গূঢ় অর্থ আছে। আপনারা জানেন, সামান্যতঃ বেদের দুই ভাগ বলা যায়—জ্ঞানকাণ্ড আর কর্ম্ম কাণ্ড। সেই অনুসারে ব্রাহ্মণ্য সমাজে পুরা কাল হইতে দুই মত চলিয়া আসিতেছে—জ্ঞানবাদ আর কর্ম্মবাদ। কর্ম্মবাদীরা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক—কর্ম্মদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। জীবকে স্বর্গাদির সাধন যজ্ঞকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাতেই জ্ঞানকাণ্ডের সার্থকতা। অপর পক্ষে জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। সাংখ্যেরা জ্ঞানবাদী, মীমাংসকেরা কর্ম্মবাদী। উপনিষদের আচার্য্যেরাও জ্ঞানবাদী ছিলেন। যখন বেদোক্ত তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়া কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভব হইয়াছিল, তখন তাঁহারা যজ্ঞভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, জ্ঞানদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। "বিদ্যয়া বিন্দতে ঽমৃতং"। যাগযজ্ঞে কোন ফল নাই। মুণ্ডক উপনিষদেই আছে—

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপতন্তি।

এই যজ্ঞরূপ কর্ম্ম সকল যাহা অষ্টাদশ ঋত্বিক্ দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে সমুদয় অস্থায়ী ও অদৃঢ়; যে মূঢ়েরা ইহাদিগকে শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দন করে তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির যে কয়েকটি উপদেশ আছে তাহার মধ্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা
জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

হে গার্গি, এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া যাহারা সহস্র সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তাহাদের কর্ম্মফল অস্থায়ী। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করা নিতান্ত বিফল-প্রযত্ন।

উপনিষদকে সামান্যতঃ বেদান্ত বলা যায়। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ সমাপ্ত হইলে

পর উপনিষদের ঋষিরা অরণ্যবাসী হইয়া আত্মজ্ঞানানুশীলনে ও ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইলেন, পরে যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে আত্মজ্ঞান উদয় হইল তখন আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা জ্ঞানতৃপ্ত হইলেন। *

আমরা যখন বহির্জগতে মানোনিবেশ করি তখন প্রথমদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাই। সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘ, জল, বায়ু, অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই সকল পদার্থে দৈব শক্তি আরোপ করা মনুষ্য সমাজের আদিমকালের লোকদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। ক্রমে জ্ঞানোন্নতি সহকারে ইহাদের মধ্যে একতা নিরীক্ষণ করা যায়; ইহারা যে একই মূলশক্তির পরিণতি, তাহা বুঝিতে পারি। তখন দেখিতে পাই যে এই বিশ্বরাজ্যে আপাত-প্রতীয়মান বৈষম্যের মধ্যে সাম্য—বৈচিত্রের মধ্যে একতা বিরাজ করিতেছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অত্যাশ্চর্য্য একতা সূত্রে গ্রথিত। মহাত্মা নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একতার প্রতি প্রথমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, তিনি এই একটা বিস্ময়জনক সমাচার পণ্ডিত মণ্ডলীর মাঝখানে উপস্থিত করিলেন যে,যে শক্তির বলে বৃন্তচ্যুত ফল ভূতলে নিপতিত হয় সেই শক্তির বলেই গ্রহ চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল স্ব স্ব পরিধিপথে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিভ্রমন করিতেছে। অন্য দিকে সুবিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ ডার্বিন তাহার বিবর্ত্তবাদে জীব জগতে ও এই একতা প্রতিপাদন করিলেন—তিনি অকাট্য প্রমাণ সহকারে দেখাইলেন যে প্রত্যেক জাতীয় জীবের আদি জীব সকল ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সৃষ্টি, এই যে পূর্ব্বতন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, তাহা ভুল—প্রকৃতিমাতা এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর জীবের বংশে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর জীব সমুদ্ভাবন করিয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই জীবাঙ্কুরের ভিন্নধা বিকাশ মাত্র। এই নিয়মে জীব প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে ইহার নাম Evolution—বিবৃতিবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ। বহির্জগতে যেরূপ, আধ্যাত্মিক জগতে ও এই একতা আরো স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করা যায়। বাহিরের বিষয় যেমন খণ্ড খণ্ড, আত্মা তেমনি অখণ্ড। আত্মা এক। আমার নানা চিন্তা, নানা ভাব, নানা প্রবৃত্তির মধ্যে সেই একই আত্মা বিরাজ করিতেছে। বাল্যকালে যে আমি ছিলাম, যৌবনে সেই, বার্দ্ধক্যে সেই আমি—এই এক আমিত্ব সূত্রে আমার সমুদয় জীবন গ্রথিত রহিয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জীবের পৃথক্ ভাব হইতে ক্রমে একত্বের দিকে চলিয়াছেন—শুধু জীব বলিয়া নয় কিন্তু জড় উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যেও মৌলিক একত্বের নিদর্শন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছেন। এই গোড়ার ঐক্য সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে; উদ্ভিদ—এবং জীবের মধ্যে আছে; জীব-

---

* বৈদিক ঋষিরা ও প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে সেই একের ঐশী শক্তি অনুভব করিতেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন বৈদিক সূক্তের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদের মধ্যে একস্থানে স্পষ্টাক্ষরে কথিত আছে—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ

যিনি এক সৎস্বরূপ বিপ্রগণ তাঁহাকে বহুধা বর্ণন করেন—তাঁহাকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলা হইয়া থাকে।

যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সম্প্রশ্নং ভুবনা যান্তি অন্যাঃ

যিনি দেবতাদের মধ্যে এক, তাঁহারই অন্বেষণে অন্য সকল ভুবন ফিরিতেছে। বেদে যে সত্যের আভাস মাত্র পাওয়া যায় উপনিষদে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

জন্তু এবং মনুষ্যের মধ্যে আছে; মনুষ্য পশু পক্ষী তরুলতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর—সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কেননা সমস্ত জগৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি।" সকল শক্তির মূল যখন এক ভগবান্ তখন সকল শক্তিই যে মূলত এক, ইহা কে না বলিবে? এই সমস্ত জগৎ—বাহ্য প্রকৃতি—আধ্যাত্মিক জগৎ সমস্তই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভেদ মাত্র।

এই বিশ্বব্যাপী একাত্মভাব উপনিষদের ঋষিদিগের জ্ঞাননেত্রে প্রকাশিত হইল। যখন তাঁহারা বাহিরের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গণকে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় আত্মাকে দেখিতে পাইলেন এবং আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ বুঝিতে পারিলেন, সেই অবধি বেদান্ত বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল। বেদেতে আত্মা শব্দ যেমন বিরল, উপনিষদ তেমনি আধ্যাত্মিক বিদ্যাতে পরিপূর্ণ। যখন ঋষিরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা একই দেখিলেন, বহু হইতে একে গিয়া পৌঁছিলেন। আবার যখন সেই আত্মার আশ্রয়স্থান পরমাত্মাকে দেখিলেন তখন সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় বলিয়া জানিলেন। তখন ঋষিদিগের অন্তর হইতে এই মহাবাক্য উদ্ঘাটিত হইল

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ আদিত্যে সএকঃ।

সেই যিনি এই পুরুষে, সেই যিনি আদিত্যে, তিনি এক। জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অনুভূত হইল। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা তিনি আত্মার অন্তরাত্মা। যিনি এই অসীম আকাশে তিনিই আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ো
ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ

যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়ো
ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়।

এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—'সর্ব্বানুভূঃ' সকল জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—'সর্ব্বানুভূঃ' সকল অনুভব করিতেছেন, তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় মুক্তি লাভের অন্য পথ নাই।

এই যে আধ্যাত্মজ্ঞান, অভেদ জ্ঞান, ইহা গীতায় সাত্ত্বিকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। পার্থক্য জ্ঞান রাজসিক।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।২০

অখণ্ড অব্যয় যিনি এক অদ্বিতীয়,
অবিভক্ত, সর্ব্বভূতে বিভক্ত যদিও,
এই একীভাব যাতে হয় প্রকাশিত,
সেই সে সাত্ত্বিক জ্ঞান, কহেন পণ্ডিত।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥ ২১

যে জ্ঞান সর্ব্ব ভূতেতে পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব নিরীক্ষণ করে সেই রাজসিক জ্ঞান। এদিকে যেমন জ্ঞানবাদী ঋষিরা বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি আস্থাশূন্য, তেমনি ইন্দ্র মিত্র বায়ু বরুণ দেবতাদিগের উপাসনাতে ও বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা জানিলেন যে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বতন্ত্র দেবতা নহে, তাহাদের মূলে সেই এক ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত। ক্রমশঃ।

ত্যাগ-ধর্ম্ম।

ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্বমানশুঃ।

না ধনের দ্বারা, না পুত্রাদির দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা কিন্তু একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই

মুক্তি লাভ হয়। শ্রুতির এই মহাবাক্য ঘোষণা করিতেছে যে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই ভবের বন্ধন-যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়। এই বন্ধন-রজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া কেহ বা মহাসাগরের ভীষণ তরঙ্গে ভাসমান, কেহ বা পর্ব্বত লঙ্ঘনে ব্যাপৃত, কেহ অরণ্যে অরণ্যে ভ্রাম্যমান, কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম অসি হস্তে দণ্ডায়মান, কেহ বা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু এ সবই ঘুচিয়া যায় যদি ত্যাগধর্ম্ম মানুষের সহায় থাকেন, যদি মানুষ বন্ধুভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে পারে। শ্রুতির এই মহাবাক্য শ্রবণমাত্রেই মহাযোগী ব্যাস-তনয় শুকদেব, সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য, মহাপুরুষ চৈতন্য প্রভৃতি সংসারবিরক্ত অতীত পুরুষগণ স্মৃতিপথে আসিয়া উদিত হন। অহো! তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরপ্রেমেই বিহ্বল হইয়া বৈরাগ্য পথের পথিক হইয়াছিলেন—তাঁহারা সংসার ছাড়িয়া সেই নিরস্তকুহকং পরম সত্যেরই স্মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা যে জনসংঘে কথিত হয়, সে সংঘ পবিত্র হয়, যে ক্ষেত্রে তাঁহাদের পদাঙ্ক চিহ্নিত থাকে সে ক্ষেত্র তীর্থে পরিণত হয়, যে হৃদয়ে তাঁহাদের ভাব জাগ্রৎ হয় সে হৃদয়ে প্রেম বৈরাগ্যের পুণ্য-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। কারণ মুক্তিগত প্রাণ যে হিন্দুজাতির প্রাকৃতিক ভাব ত্যাগ, তাঁহারা তাহারই চরম আদর্শ ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করি। সন্ন্যাসীর ত্যাগের প্রকাশ অরণ্যে, জনপদের প্রান্তভূমিতে ও নগর-পথে, বৃক্ষতলে এবং কৌপীন কম্বলে দীপ্যমান। তাঁহারা গৃহ-বন্ধন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু "প্রজাকামোবৈ প্রজাপতিঃ" ঈশ্বর চান প্রজাসৃষ্টি, গৃহবন্ধন—গৃহশৃঙ্খলা। ত্যাগের অমৃতোপম ধর্ম্ম ঈশ্বর চান সেই গৃহেই প্রতিষ্ঠিত করিতে। তবে গৃহীর ত্যাগ কোথায়? গৃহীর ত্যাগ দানে—গৃহীর ত্যাগ সেবায়, গৃহীর ত্যাগ প্রতিপালনে, গৃহীর ত্যাগ আত্মসংযমে। গৃহী যখন ক্ষুধিতের আর্ত্তরবে আকৃষ্ট হইয়া অন্নথাল তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন, তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; গৃহী যখন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কলত্র, বন্ধু-বান্ধব ও দাসদাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া যথাযোগ্য রূপে আপনার অন্ন বসনে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন ও তাহাদিগের সকল অভাব মোচনে নিজেকে ভৃত্যবৎ নিযুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; গৃহী যখন পীড়িতের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া ঔষধ পথ্যের দ্বারা তাহার শুশ্রূষা করেন, তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; গৃহী যখন অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান ও অসৎকে সৎপথে আনয়ন করেন তখন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়; সংসারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই ক্রন্দন উঠিতেছে যে, "খণ্ড বিহণ্ড কালতন্ করি হ্যায়। শক্কট মহা এক দিন পড়ি হ্যায়" এই কালপ্রবাহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-জ্বালার মধ্যে যিনি আত্মসংযম করিয়া ধৈর্য্যের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতে পারেন তাঁহার ত্যাগ সাধিত হয়।

যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া, ইহার সমস্ত বিভীষিকাতে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া কেবল ব্রহ্মপ্রীতিতে নিমগ্ন থাকেন তাঁহাদের সে ভাব পরম সুন্দর, কিন্তু তাহা ভীরুজনোচিত ত্যাগ ধর্ম্ম, কিন্তু যিনি সংসারের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ থাকিয়া, তাহার চতুর্দ্দিক-ব্যাপী জ্বালাময়ী অনলের মধ্যে দগ্ধ হইয়াও ধৈর্য্যের সহিত অকাতরে দান, সেবা, প্রতিপালন ও আত্মসংযম কার্য্যে আপনাকে

নিযুক্ত রাখেন ও তাঁহারই মধ্যে আত্ম-কোষে নিরঞ্জন নিষ্কলঙ্ক পরব্রহ্মের প্রতি জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত রাখিয়া ভক্তিপুষ্পে তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন সেই গৃহীর ত্যাগকেই বীরজনোচিত ত্যাগ ধর্ম্ম বলে। তিনিই শূর শব্দের প্রকৃত বাচ্য।

কেহ হয় ত বলিবেন যে, দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য কি এই সুখ দুঃখময় সংসারে চিত্ত-চাঞ্চল্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু যাঁহার সাধু ইচ্ছা আছে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়—সাধু মহাজনেরা বলিয়াছেন যে, "সৎসঙ্গত মিলে সো তরেয়া" যিনি সাধুসঙ্গ করেন, সৎপ্রসঙ্গ করেন, শ্রেয় ও প্রেয় পদার্থের বিচার করিয়া শ্রেয় পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার চিত্ত সহজেই প্রশমিত হয়। "ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" যখন শরীরী আত্মার প্রিয় ও অপ্রিয় হইতে নিষ্কৃতি নাই তখন আত্মানাত্ম বিচারই অবলম্বনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন দুঃখ ভোগের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা সুখ ভোগের মত্ততা ধর্ম্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব চলচ্চিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক—যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে; এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্য-শীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না। যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই সৎকর্ম্ম ও সাধু কর্ম্ম জানিবে। তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবুদ্ধি দীপ্তি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয়-বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়; পরিশেষে তাহারা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সকলই আমার কিন্তু কিছুই আমার ভোগের জন্য নহে বরং উৎসর্গের জন্য—এই যে মহৎ ভাব, ইহাতে ভোগ ও বিসর্জ্জন যুগপৎ সাধিত হয়। সকলই দিলাম কিন্তু সকলই রহিয়া গেল, অথচ সেই রক্ষণেই জগৎ মুগ্ধ হয়। আত্মা পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উৎপন্ন করে এবং তদ্দ্বারা সংসার-কার্য্য ও ভোগ কার্য্য সম্পন্ন করে—আপনাকে দান করিয়াই আত্মার আত্মত্ব, আত্মদান না করিলে মনুষ্য মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না, আত্মদানেই জগৎ বশীভূত হয়। প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া শরীরকে ধারণ করে। নাড়ী এবং শাখানাড়ী সমূহে ব্যান, অধোতে অপান, উর্দ্ধে উদান, মধ্যে সমান এবং চক্ষু শ্রোত্রে মুখ নাসিকায় মুখ্য প্রাণ অবস্থান করতঃ সকলকে নিষ্কাম ভাবে আপনার

শক্তি দান করিয়া সঞ্জীবিত রাখিতেছে— ইহাই ত্যাগ, ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাই গৃহীর ধর্ম্ম, এই ত্যাগই গৃহীর ত্যাগ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞ-দান-তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং ॥
এতান্যপি তু কর্ম্মানি সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্তা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥

পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস কহেন এবং বিচক্ষণেরা সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। হে ভরতসত্তম সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার বাক্য নিশ্চয় শ্রবণ কর। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, প্রত্যুত তাহা অনুষ্ঠেয়। যজ্ঞ, দান ও তপ মনীষী দিগের চিত্তশুদ্ধি-কর। এই সমস্ত কার্য্য আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই আমার উৎকৃষ্ট নি-শ্চিত মত। কিন্তু নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ সঙ্গত নহে, মোহ প্রযুক্ত তাহার ত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে অনুষ্ঠাতা দুঃখ জনক বলিয়া কেবল কায় ক্লেশ ভয়ে নিত্য-কর্ম্ম ত্যাগ করে সে ত্যা-গকে রাজস বলা যায়। সেই কার্য্যে অনুষ্ঠাতা কদাচ ত্যাগ-ফল লাভ করিবে না। হে অর্জ্জুন, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যে নিয়ত কর্ম্ম, আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া, কৃত হয় সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এই কথাতেই যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ গৃহীর ত্যাগ ধর্ম্মের বিশিষ্ট উপদেশ দিয়া গিয়া-ছেন। ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম— "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদু-পাসনমেব" ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই পবিত্র মন্ত্র ইহার প্রাণ। যিনি এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া এই সত্য সাধন করেন, তিনিই প্রকৃষ্ট ব্রাহ্ম।

নানা কথা।

ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব তাঁহার বিশাল ব্যাপকত্ব মনে ধারণা করা বড় কঠিন। তাঁহার স্বরূপ উপনিষদের ঋষিরা ধ্যানযোগে হৃদয়ে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া সরল সহজ ভাষায় স্বল্প-বাণীতে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজনীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, মন তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না; ইহাও জানি না যে কি বলিয়া তাঁহার উপদেশ দিতে হয়; যাহা কিছু জানি বা না জানি তাহা হইতেও তিনি ভিন্ন ও অতিরিক্ত। কি অমায়িকতা! ঈশ্বরকে পাইয়া তাঁহাদের প্রগল্‌ভতা উপশান্ত, ভগবদ্দর্শনে তাঁহারা অবাক ও নিস্তব্ধ; ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যাহা লইয়া তাঁহারা উপদেশ দিবেন। এই ত ভারতের এক অতি-প্রাচীন-যুগের চিত্র। কিন্তু মধ্য-যুগে সে ভাব সে তপস্যা জ্ঞানের সে উন্নতি যেন বিলুপ্ত। ক্ষত্রিয়বীর লইয়া পূর্ণব্রহ্ম স্থাপন করিবার জন্য কি এক উদ্দাম চেষ্টা। ইন্দ্রিয়ের অতীত পুরুষের স্থানে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনুষ্যবিশেষের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠা! তুলনা করিয়া দেখিলে এ কি ভয়ানক দুর্গতি, মানসিক শক্তির কি ঘৃণিত হীনতা! ঈশ্বরকে তাঁহার পূর্ণমহিমায় অনন্তের আভাসে চিত্রিত করিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ দেবমূর্ত্তি দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টার অভাব। নিজে ক্ষুদ্র, ঈশ্বরকেও ক্ষুদ্র করিয়া নিজের অপূর্ণ অনুরূপে গঠন করিয়া তাঁহার সেই

অপূর্ণ মহিমা ঘোষণা করিতে সকলে লালায়িত। তাই বিলাতের একেশ্বরবাদী ঈশার দেবত্ববিরোধী চার্লস্ ভইসী বর্ত্তমানবর্ষে প্রদত্ত তাঁহার ৭ম বক্তৃতার উপসংহারে আমাদেরই মত ক্ষুব্ধ হইয়া সৎসাহসের সহিত বলিতেছেন "the deification of Jesus is the grand historical testimony to the meanness of men's thoughts about God." ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতার পরিচয় যে মনুষ্য বহুকাল পূর্ব্ব হইতে দিয়া আসিতেছে, যিশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব স্থাপনের চেষ্টা তাহার বলবৎ প্রমাণ।

অবশ্য যাঁহারা অবতারত্ব স্বীকারের ভিতরে শাস্ত্রকারগণের গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত দেখিতে পান এবং সেই ভাবেই বুঝাইতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে লোকে প্রচ্ছন্ন সত্য আর দেখিতে চাহে না। সকল কথা সকল উদ্দেশ্য পরিষ্কার ও পরিস্ফুট ভাবে শুনিতে ও বুঝিতে চায়। সত্য লাভের উৎকণ্ঠাকে সে আর কিছুতেই রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান যুগ জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন প্রতীক্ষা করে। জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্মার্থীর স্বাধীন চিন্তাকে আজকাল সুপথে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। এইখানেই গুরু ও আচার্য্যের প্রকৃত দায়িত্ব।

অতীতে শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সে দিন ত্রিবাঙ্কুরে গিয়া ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন "you should have a rational admiration for the past and a desire for progress.' অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে এবং উন্নতি লাভের জন্য সচেষ্ট হইবে। অন্ধভাবে শ্রদ্ধান্বিত হইতে তিনি বলেন নাই। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া অতীতকে শ্রদ্ধা কর। বাস্তবিকই ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার এমন অনেক সামগ্রী রহিয়াছে, ভারতের গৌরবান্বিত অতীতে যাহাদের জন্ম। ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান অন্যত্র অতুলন। সে ব্রহ্মজ্ঞান আহরণ প্রকাশ ও প্রচার করিবার জন্য মহাত্মা রামমোহন রায়কে ভিখারীর ন্যায় অন্যত্র যাইতে হয় নাই। তিনি ডুব দিয়া রত্নোত্তোলন করিয়েন। অতীত ভারতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগ। উপনিষদ-মন্ত্রে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। অতীতের সেই ঋষিভাব সেই ঋষিপ্রকৃতি তাঁহাতে অবতরণ করিল। তিনি শান্ত ভাবে সাধনা করিয়া যে পদাঙ্ক রাখিয়া গেলেন, তাহা অবলম্বন করিতে পারিলে সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে কখনই পরিভ্রষ্ট হইতে হইবেক না। আমরাও বলি সুদূর অতীতে বিরচিত উপনিষদের অনির্ব্বাণ আলোক ধরিয়া ধীর-পদনিক্ষেপে অগ্রসর হও, ব্রহ্মধাম সুগম হইয়া পড়িবে।

আদর্শ পুরুষ।—অনেকের মতে ধর্ম্মের ভিতরে একজন আদর্শ পুরুষ স্বীকারের আবশ্যকতা আছে, যাঁহার উদাহরণ ও কার্য্য দেখিয়া আমরা জীবনকে ও কর্ত্তব্যকে নিয়মিত করিতে পারি। তিনি মৃত হইলেন তাহাতে কি, ইতিহাসগত তাঁহার জীবনে শিক্ষা ও সান্ত্বনা লাভ করিবার অনেক বিষয় আছে। তাঁহারা ইহাও বলেন উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অনেকাংশে বিশেষ ফলপ্রদ। এই জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় কেহ বা ঈশাকে, কেহ বা মহম্মদকে, কেহ বা শাক্যসিংহকে, কেহ বা গৌরাঙ্গকে তাঁহাদের ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত করিতে চান। ইহাঁদের জীবনের আলোক আমাদের মত অসার নিরাশ জীবনকে যে আলোকিত করে, ইহাঁদের কণ্ঠোদগীরিত সত্য যে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আমাদের মর্ম্মের ভিতরে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া যায়, ত্যাগ-স্বীকারের মহৎ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে যে সংসার বিমুখ করিয়া তুলিবার উপক্রম করে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতার পরিমাণ এত অধিক, যে তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্তে জীবনকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা না পাইয়া, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের স্থান অর্পণ ও তাঁহাদের মহিমা ঘোষণার জন্য লালায়িত হই। যাঁহারা শান্তি স্থাপন করিবার জন্য সমগ্র জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহাদের নামের ধ্বজা—সম্প্রদায়ের পতাকা—স্কন্ধে ধারণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদয়ের সহিত কলহ-বিবাদ, সংগ্রাম ও রক্তপাতে প্রবৃত্ত হই। এই সকল ধর্ম্ম প্রবক্তার মধ্যে কে অগ্রণী, তাহা লইয়া তর্ক-যুদ্ধে পরস্পরকে অবমাননা ও তুচ্ছ করিতেও এই জ্ঞানোজ্জ্বল সময়ে কুণ্ঠিত হই না। ঈশ্বরকে যদি আমরা জীবনের আদর্শ করিয়া লইতে পারি, কত বিবাদ বিসম্বাদ অবসান হয়, কত শত যুক্তি তর্ক নিরর্থক হয়। কত (dogma) অন্ধ সুদৃঢ়-ধারণা দূরে পলায়ন করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরে মিলনের পথকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারে, কত শত অনাদৃত সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা পায়। মহৎ দৃষ্টান্ত অবশ্যই গ্রাহ্য, কিন্তু তুমি আমি যাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিতে যাই, তিনি মনুষ্য—তিনি অপূর্ণ—তিনি দোষের অতীত নহেন—একথা ও স্মরণে রাখিতে হইবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, কার্ত্তিক মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৩৫।৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৮৬॥/৯
সমষ্টি	...	৩২২২ ৻৩
ব্যয়	...	৩৬৭৶৩
স্থিত	...	২৮৫৪৸/০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
অদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
২৫৪৸/০

২৮৫৪৸/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪০০।৵০

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে
প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲
কোং কাগজ ক্রয় করা যায়
২০০৲
পুরাতন কেরোসিন টিন বিক্রয়
।৵০

৪০০।৵০

তত্ত্ববোধিনা পত্রিকা	...	৩৬।০
পুস্তকালয়	...	৪৵৬
যন্ত্রালয়	...	৯০৲
ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪॥৵০
সমষ্টি	...	৫৩৫।৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩১০।/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৩ ৻৬
পুস্তকালয়	...	।/৯
যন্ত্রালয়	...	৩২।৶৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১ ৻৩
সমষ্টি	...	৩৬৭ ৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আন্দুল আর্য্য-ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১২ পৌষ শনিবার ২৫শ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭ ঘটিকা ও সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বিশেষ উপাসনা হইবে; সাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহীরালাল মল্লিক।
সম্পাদক।
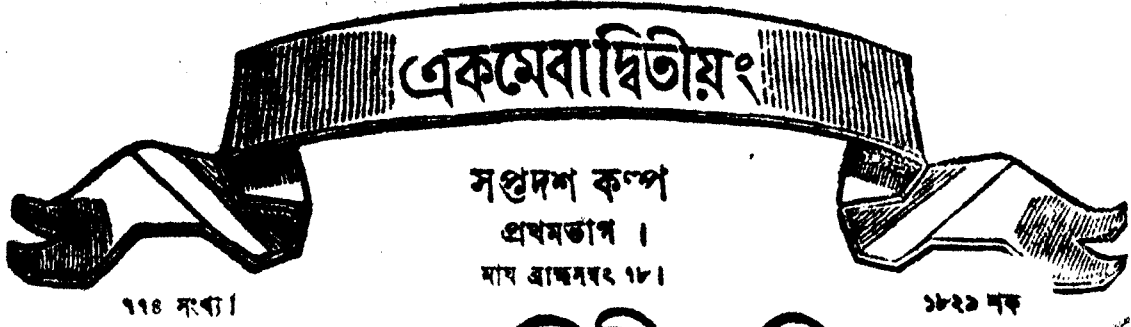
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শান্তিনিকেতনের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

বালার্কের সুবর্ণ কিরণোদ্ভাসিত রমণীয় তপোবন সুমধুর ঘন ঘন ঘণ্টা নিনাদে ও সুগভীর দামামা ও শঙ্খ রবে জাগরিত হইলে এবং গগনতল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছটায় উদ্ভাসিত হইলে, সঙ্গীতবিশারদের কলকণ্ঠ বিনিঃসৃত সুললিত "দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান" সহকারে উপাসকবৃন্দ প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ করিলেন। আশ্রমের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেরই দৃশ্য চিত্তকে সহজেই ব্রহ্মচৈতন্যে উদ্বোধিত করিয়া দেয়। শান্তিনিকেতনের বাহিরের এই সমস্ত অনুকূল অবস্থার সহিত মহর্ষিদেবের অমর ধর্ম্মজীবন এমনি সংজড়িত যে এখানকার শিল্প-শোভাপূর্ণ দেবকীর্ত্তি নিচয়, নয়ন স্নিগ্ধকর সজীব হরিৎকান্তি তরুলতা, সুনির্ম্মল আকাশ, সুবিমল বায়ু, উজ্জ্বল তপন কিরণ, বন্দনার বেদমন্ত্র ও মৃদঙ্গ ধ্বনি সহ বিচিত্র রসের মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত মধ্যে তাঁহার ভাব চিন্তা ও মহান উদ্দেশ্য যেন জীবন্ত আকার ধরিয়া অমৃতধামের যাত্রীদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছে। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মোপাসনার প্রধান সহায় হইয়া এই পবিত্র তীর্থ সংস্থাপনানন্তর তাহাতে নিজের দীক্ষানুষ্ঠানের স্মরণার্থ ব্রহ্মোৎসব সংযোগ করত আধ্যাত্মিক প্রেম-যোগে নীরবে অদ্যাপি আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। যাহাদের দিব্য কর্ণ আছে তাহারা এখনও তদীয় অলৌকিক বাণী শুনিতে পায়, এবং যাহাদের দিব্য চক্ষু আছে তাহারা সেই যোগজীবনের অমর মূর্ত্তি সন্দর্শন করে। শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক মহোৎসব ভক্ত ব্রাহ্মগণের অতীব আনন্দজনক। স্থান কাল পাত্র তিনই যোগ বৈরাগ্য ও শান্তি রসের উদ্দীপক। পার্থিব জীবনের অসার কোলাহলে বিক্ষিপ্ত, সংসারের গুরুভারে শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয় এখানে সময়ে সময়ে যে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া কৃতার্থ হয় তাহা আত্মারাম ঋষি তপস্বীগণেরও পরম প্রার্থনীয়। বিবিক্তসেবী বনবাসী আর্য্য পিতামহগণ যে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া আর্য্যজাতিকে গৌরবের উচ্চশিখরে তুলিয়া

গিয়াছেন সেই পরম ধন লাভের যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে এই নির্জ্জন আশ্রম যে পরম পবিত্র তীর্থ তাহার আর সন্দেহ নাই।

নিমন্ত্রিত সমাগত যাত্রীগণ ৬ই পৌষ রজনীতে এখানে কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। তাঁহাদের সেবা পরিচর্য্যার ব্যবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সুন্দর হইয়াছিল। উষাকালে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলে পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া মন্দির মধ্যে সমবেত উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আগন্তুক ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকগণে উপাসনা মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলে স্ব স্ব আসনে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট হইলে শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘকলেবর বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্ম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় শ্রীমন্মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রথমে সকলের সহিত শুভ্র শিলাতলে দণ্ডায়মান হইয়া "পিতা নোসি" এই শ্রুতি পাঠান্তে তিনি প্রণাম করিলেন। পরে যথাক্রমে স্তব, আরাধনা, গায়ত্রী মন্ত্র পঠিত হইল। পরিশেষে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

অনন্তর মধ্যাহ্ণ ভোজন সমাপ্ত হইতে না হইতে প্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ অধিকারীর যাত্রা আরম্ভ হয়। এতৎ প্রদেশীয় সাধারণ নরনারী বালক ও যুবকগণকে শান্তিনিকেতনে আকর্ষণ করিবার জন্য মহর্ষিদেব এইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ গীত বাদ্য ও আতসবাজী ইত্যাদির স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। আতসবাজী দেখিবার ও যাত্রা শুনিবার জন্য প্রতি বর্ষে এখানকার প্রশস্ত প্রান্তরে বহু দূর হইতে বিস্তর লোক সমাগত হয়। অনুমান সাত আট সহস্র নরনারী এবার একত্রিত হইয়াছিল।

মহা কোলাহল এবং জনতার মধ্যে সায়ংকালীন উপাসনা হইয়াছিল। তৎকালে চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের অনেক ভদ্রসন্তান স্থির ভাবে উপদেশ ও সঙ্গীত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যাকালের উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। নৈতিক কর্ত্তব্য, ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন, ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল। প্রসিদ্ধ সুগায়ক শ্যামসুন্দরজী একাকী দুই বেলা গান করেন। তাঁহার সুশ্রাব্য মধুর গম্ভীর স্বরসংযুক্ত গীত গুলি শ্রোতৃগণের চিত্তকে আর্দ্র করিয়াছিল। নীলকণ্ঠ অধিকারী পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। এক্ষণে কয়েক বৎসর হইতে তিনি ভক্তির সহিত এখানকার উপাসনায় যোগ দেন এবং তাহাতে তিনি পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

উপাসনান্তে আতসবাজী পোড়াইবার ব্যবস্থা। বিচিত্র বর্ণের আলোকমালা, ঊর্দ্ধে প্রস্ফুটিত কুসুমাকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল দর্শনে "বলিহারী! বলিহারী! বাহোবা" রবে সহস্র কণ্ঠ অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সর্প, হস্তী, তোরণদ্বার, কদম্ববৃক্ষ, কতই সুন্দর সুন্দর সব আতসবাজী! উপরে অনন্ত নীলিমার ক্রোড়ে এই সকল পদ্মরাগ অয়স্কান্ত নীলকান্ত মণিহারের সমুজ্জল আলোকচ্ছটা, দেখিতে অতি সুন্দর, নয়নরঞ্জন। পরিশেষে অনিত্য আলোকগুলি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কেবল নিত্যবস্তু "ওঁ" মৃদু কিরণে দীপ্তি পাইতে

লাগিল। এই সাময়িক আমোদ ও উল্লাসকর ব্যাপারের মধ্যেও মহাজ্ঞানী গম্ভীর প্রকৃতি মহর্ষির কবিত্বের মাধুরী অবলোকন করিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? নিত্য শান্তিপূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ শান্তিনিকেতনের মধ্যে বৎসরান্তে একদিন এইরূপ আনন্দোৎসবে নিত্য নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পুরুষের প্রেমলীলার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ইহার দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য বিষয়গুলি শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের বক্তৃতা।

পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্তের বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন ঋষিধর্ম্ম, ভারতের বিশেষ গৌরবের সামগ্রী ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস-পানকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য যে মহাত্মা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যকার দিনকে যিনি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই দেব জীবন ও সেই শুভ দিনের মহাত্মাকে আজ সকলে উপলব্ধি করিতেছি। মহর্ষির অন্তরস্থ ব্রহ্মানুরাগের মধুর গাম্ভীর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পক্ষে অদ্যকার উৎসবের দিন একটী বিশেষ পবিত্র দিন। তাঁহার আত্মার স্বর্গীয় জ্যোতি শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে এই উৎসবের আনন্দ মূর্ত্তি ধরিয়া অদ্য প্রকাশ পাইতেছে। এস আজ প্রাণ ভরিয়া সকলে সেই মূর্ত্তি দেখি এবং দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ভাবিতে সেই মহাপুরুষের যোগমগ্ন আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হই। তিনি যেমন উল্লাসের সহিত সনাতন ঋষি-বাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতেন সেই ভাবের ভাবুক হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, ব্রহ্মপূজা কেমন সরস সুন্দর হৃদয়ানন্দকর দেববাঞ্ছনীয় পরম পদার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদ আজ সকলে গ্রহণ করি।

আমরা এক্ষণে স্বদেশজাত পার্থিব বস্তুর উন্নতির জন্যর সকলেই অতিশয় উৎসাহিত এবং প্রমত্ত হইয়াছি। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য যে অবিমিশ্র স্বদেশী ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মারাধনার উদ্ধার এবং বিকাশ সাধন পূর্ব্বক তাহা আচণ্ডাল জাতি নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিয়া গেলেন তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াও ধারণা ও সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না। যে বেদমন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রী শ্রবণে নিম্নাধিকারী স্ত্রী শূদ্র এত দিন বঞ্চিত ছিল এক্ষণে তাহা ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে, কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে, ইহা কি আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় নহে? হায় এমন পরমতত্ত্ব চরমধর্ম্ম যিনি অধিকার করিয়া জীবনে তাহা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া গেলেন তাঁহার চরিত্রের মূল্য আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছি না। তাঁহার বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া ও প্রাণপ্রদ উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া এবং স্নেহভাবে অনুপ্রাণিত মধুর গম্ভীর সংগীত সকলের সুধারসে হৃদয় মগ্ন হইতেছে, বার বার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-বিষয়ে দৃষ্টি পড়িতেছে, তথাপি নিত্যবস্তু সারাৎসার পরব্রহ্মে মন মজে না, তাঁহার ধ্যান চিন্তা জ্ঞানানুশীলনে অন্তরে অনুরাগ জন্মে না। অনন্ত অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় চিন্ময় তত্ত্ব সহজে আয়ত্ত হয় না সত্য, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রকাশ যে আধারে মূর্ত্তিমান আকারে প্রকটিত হইল,

যে অমর দেবচরিত্র নিগূঢ় অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি প্রভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া মানবসমাজের ইতিহাসপটে চির দিবসের জন্য অঙ্কিত রহিল, পরিদৃশ্যমান সেই জীবন্ত স্থবির মর্য্যাদা কি আমরা বুঝিতে পারিলাম ? না তদ্দর্শনে আমাদের পরিত্রাণের আশা বিশ্বাস বাড়িল ? মহাজনদিগের কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে ভাল, তাঁহাদের চরিত্রকাহিনী শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়, অথচ তাঁহাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া আমরা অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হইতে চাহি না, শিয়রে শমন দেখিয়াও চৈতন্যোদয় হয় না, হায় কি বিড়ম্বনা !

কোন কারণে বাধ্য হইয়া যদি আমরা একখানি বিলাতি বসন ক্রয় করি, স্বদেশানুরাগী যুবক বন্ধুরা তাহা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হন, এবং ভৎসনার সুরে বলেন, "মহাশয়, শ্বেতশ্মশ্রু পককেশ হইয়া এমন গর্হিত কাজটা করিলেন" ! এদিকে চিরন্তন-পৈতৃক ধন, জীবনের অন্নপান স্বরূপ স্বদেশী ব্রহ্মবস্তুর কথা বলিলে কাহারও তাহাতে আস্থা জন্মে না। আজকালের দিনে ভবের বাজারে তাহার যেন কোন মূল্যই নাই। যাঁহার ইচ্ছায় জন্মিয়া জীবিত আছি, প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহাকে ভুলিয়া, উপেক্ষা করিয়া দেশের এ কি ভয়ানক দুর্গতি উপস্থিত হইল ! দুই দিন পরে যাঁহার চরণে আত্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে, তিনি কি স্বদেশী বস্ত্র, দেশলাই, সাবান ইত্যাদির অপেক্ষা প্রয়োজনীয় নহেন ?

চিন্তাহীন অনাত্মদর্শী মানব মনে করে, যাঁহার রূপ রস গন্ধ নাই, যাঁহাকে ধরা ছোঁয়া দেখা শুনা যায় না, অর্থাৎ যদ্দারা এই জরামরণশীল অনিত্য জীবনে কোন অনন্ত তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই তাহা লইয়া আমি কি করিব ? মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে যাহা বলিয়াছিলেন ইহা ঠিক তাহার বিপরীত বৈরাগ্য ! ভোগবিলাস পথের পথিক নির্ব্বেদ সহকারে মনে মনে বলেন, হায় আমি প্রচুর বিলাস ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাইলাম না ; সুরম্য হর্ম্ম্য, বিচিত্র উদ্যান, মনোহর যান বাহন, অর্থ বিত্ত আমার ভাগ্যে ঘটিল না ; এবং সুন্দর নয়নরঞ্জন হৃষ্টপুষ্ট দেহধারী স্বজন বান্ধব, বিদ্যোপাধি বিশিষ্ট পুত্র কন্যা প্রভৃতি সম্পদ সুখ সম্ভ্রম আমার কিছুই নাই, আমি কি মন্দ ভাগ্য ! আমার না জন্মানই ভাল ছিল।

একথার কি সন্তোষজনক উত্তর ও প্রতিবাদ নাই ? মহর্ষিজীবন ইহার প্রতিবাদ এবং সদুত্তর। যদি বল, তিনি ধনী জ্ঞানী বিধাতার বিশেষ কৃপা পাত্র, তাই তিনি সাধু মহাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের কি ? আমরা পোষ্য-ভারাক্রান্ত গৃহী, অর্থচিন্তা ব্যতীত পরমার্থ চিন্তার আমাদের সময় নাই সাধন তপস্যা ত দূরের কথা ; সংসারের ভার বহিতে বহিতে, দুঃখের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, আমাদের জীবন শেষ হইয়া যাইবে। আরও কথা এই, অনন্ত নির্ব্বিশেষ নিরাকারকে ভাবিয়া ফল কি হইবে ? পার্থিব জীবনের কোন্ কাজে তাহা লাগিবে ? দৈহিক অভাব যাহাতে মোচন হয় কেবল তাহা করিয়াই আমরা চলিয়া যাইব, সূক্ষ্ম নিরাকার অতীন্দ্রিয় বিষয় ভাবিতে পারি না। ভাবিতে গেলে মাথার মধ্যে যেন কিরূপ গোলমাল বোধ হয় ; চিত্ত বিভ্রান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। মুখে এ প্রকার কেহ বলুন বা না বলুন, মনে মনে ইহাই অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত, শেষ সিদ্ধান্ত। ইহা অবশ্য সত্য কথা যে,

বিষয়ে জড়িত থাকিলে যোগ বৈরাগ্য সাধন করা যায় না, এবং নির্ব্বিশেষ অনন্ত পরমাত্মার সম্যক ধারণাও সম্ভব নহে; সুতরাং তাহাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। সচরাচর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, উপদেশ এবং প্রার্থনায় একদিকে মহান্ সর্ব্বাতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং অপর দিকে তাঁহার পিতৃত্ব মাতৃত্ব বন্ধুত্ব প্রভৃতির নিকটতর সরস সম্বন্ধের কথা যাহা শুনি তাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি বিচার চিন্তা এবং ভাব ভক্তি আপাততঃ চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু সে সকল তত্ত্বের বাস্তবিকতা সহজে আত্মস্থ এবং জীবনগত হওয়া বড়ই কঠিন। এই কঠিন সমস্যা ব্রাহ্মগণ এখনো ভালরূপে পূরণ করিতে পারেন নাই।

ইতিহাসে মহাজন চরিতে এইরূপ ধর্ম্মসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত আছে, আমাদের ভক্তিভাজন মহর্ষিদেবও ইহার সাক্ষী। তিনি বিস্তীর্ণ বিষয়, বৃহৎ পরিবারের ভার মাথায় লইয়া তাহার সুব্যবস্থা সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেন, তৎসঙ্গে সজনে বিজনে, পরিবার মধ্যে তপোবনে একাকী গভীর ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। প্রত্যেক ছোট বড় জ্ঞানী অজ্ঞানী নরনারীর পক্ষে ইহা কি এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত এবং আশার সমাচার নহে? জ্ঞানেও ভ্রম থাকিতে পারে, ভাবে ভক্তিতেও অন্ধতা অসারতা প্রকাশ পায়, আবার কর্ম্মেও আসক্তি আছে, কিন্তু জীবনে চরিত্রে এই তিনের বিশুদ্ধ সমন্বয়, এবং আত্মাতে যে দেবাবির্ভাব দেবলীলা তাহা ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ সত্য। ঈদৃশ ভক্তজীবন দর্শনে আমাদেরও কি আশা হয় না যে সাধন করিলে আমরাও এক দিন সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব? সত্যের সামঞ্জস্য, জীবনের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইব? ভক্ত মহাজনগণ এ পথের প্রধান সহায় ও উত্তর সাধক। তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ ভিন্ন এ পথে অগ্রসর হইবার আর সহজ উপায় কিছুই নাই। একদিকে তাঁহাদের শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, এবং আশীর্ব্বাদ, সহানুভূতি অপর দিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগ, ভগবৎ—সান্নিধ্যের নিঃসংশয় অনুভূতি। নির্গুণ সত্তার চিন্তা ও যাবতীয় জীবনক্রিয়া মধ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের উপলব্ধি এবং নিজের জ্ঞান ইচ্ছা ভাবের ভিতরে তাঁহার সহিত একাত্মতা অনুভব, ইহাই চরম অবস্থা। বৃথা আমিত্বের অভিমান সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইবে, তাহার স্থানে স্বয়ং বিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা সদ্‌গুরু অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হইয়া আমাদের জীবনযন্ত্রকে পরিচালিত করিবেন। অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মরূপ পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে জীব নিরন্তর মগ্ন থাকিবে। বিশেষ বিশেষ খণ্ড জ্ঞান ও স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞানের রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতিসূক্ষ্ম চিন্ময় অনন্ত ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগজীবন লাভের কোন আশা নাই। কর্ম্মযোগ সাধন তাহার এক মাত্র সোপান। কর্ম্মাধ্যক্ষ বিধাতা প্রতিমানবের বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি এবং হৃদয়ের ভাব ভক্তির ভিতর দিয়া শক্তিরূপে দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে পরিচালিত করিতেছেন এইরূপ ধারণা আবশ্যক! সে রাজ্যে তিনিই আলোক, পথপ্রদর্শক এবং তিনিই স্বয়ং গুরু ও নেতা। দিব্যজ্ঞানালোকিত ইচ্ছা-যোগ-সমন্বিত এই নির্ব্বিশেষ অভেদ জ্ঞানে পৌঁছিতে হইলে স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনা, অবস্থা, চিন্তা, কার্য্য, আশা, কামনার অভ্যন্তর দিয়া সূত্রভাবে পরমাত্মার সঞ্চরণ এবং অব্যবহিত ক্রিয়া-যোগ উপলব্ধি করিতে হইবে। এইরূপে যখন ব্রহ্মেতে নিত্য স্থিতি হয়, তাঁ-

হার জ্ঞান ইচ্ছা ভাবের সহিত জীবন একীভূত হইয়া যায় তখন আর ভেদবুদ্ধি তিষ্ঠিতে পারে না, ইষ্ট দেবতার সহিত দেখা শুনার অভাব কিম্বা বিচ্ছেদ স্বতন্ত্রতা বোধও থাকে না। তখন এই যে মহাশূন্য অসীম আকাশ তাহা অনন্তের আবির্ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, এবং দেশকালে বদ্ধ এই বাহ্য পদার্থগুলি আমাদিগকে আর আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। মায়াবন্ধন বিমুক্ত আত্মার নিকট সকলই প্রমুক্ত অনাবৃত। তাহার দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ সেই জীবন্ত জাগ্রত পরমপুরুষে সংলগ্ন থাকে।

হে চিরজীবনাশ্রয় হৃদয়বাসী অন্তর্য্যামী পুরুষ, আমরা যেন তোমাকে অতিক্রম করিয়া কোন চিন্তা বা কার্য্য না করি। যেন প্রতিক্ষণে তোমার অনুগমনই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ও লক্ষ্য হয়। যখন যে কর্ত্তব্য উপস্থিত হইবে তোমার নিকট তদ্বিষয়ে পরামর্শ এবং সাহায্য ভিক্ষা করিব। এমন কি কার্য্য আছে যাহা তোমা দ্বারা উদ্ধার হইতে না পারে? সদাকালের সঙ্গী তুমি, সুদীর্ঘ জীবন পথে যখন যাহা কিছু অভাব হইবে তাহা তুমি পূর্ণ করিয়া দিবে। অন্য উপায়ে যদি তাহা পূর্ণ না হয়, অথবা আমাদের সময়ে সময়ে যদি গভীর ক্ষতিই বা উপস্থিত হয়, তুমি সে অবস্থাতে আপনাকে দান করিয়া আমাদের সকল ক্ষতি পূর্ণ করিয়া দিবে। তুমি পূর্ণকাম, তুমিই পরম পুরুষার্থ; আশীর্ব্বাদ কর, নাথ, যেন তোমার অভয় বাণী শুনিয়া এবং প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা সকল অভাব দুঃখ ভুলিয়া যাই এবং তৃপ্তকাম হই।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উপদেশ।

জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।

আমি জানি যে কর্ম্মলব্ধ ধন অনিত্য। এই অধ্রুব পদার্থের দ্বারা সেই ধ্রুব সত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, হে ভ্রাতৃগণ, কি লক্ষ্য করিয়া—কাহার উপাসনার জন্য বৎসরে বৎসরে এই পুণ্য দিনে শান্তিনিকেতনে আসিয়া আমরা সমবেত হই? ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি নহে? হৃদয়ের আকর্ষণ এবং গতি কি সেই ধ্রুব সত্যের দিকে পরিচালন করিবার জন্য নহে? যাঁহার ইচ্ছাতে প্রেরিত হইয়া আমাদের শরীরের মধ্যে মন মনন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছাতে প্রাণ প্রেরিত হইয়া আমাদের শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছাতে নিযুক্ত হইয়া আমাদের মুখ দিয়া বাক্য স্ফুরিত হইতেছে, যে দেবতা চক্ষু শ্রোত্র দিয়া আমাদের সম্মুখে জগৎ সৃষ্টির অনন্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনাই ধ্রুব সুখ শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। সংসারের পাপ তাপ ও বদ্ধ-ভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার উদার প্রীতিতে আপনার আত্মাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া মুক্ত হইবার জন্যই ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁহাতে প্রীতি করা আবশ্যক। পরমেশ্বর পাপের মোচয়িতা ও মুক্তিদাতা, তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে পাপ তাপ হইতে, সংসারের মোহ-বন্ধন হইতে উদ্ধার নাই। বিষয়াসক্তিই মোহ-বন্ধন, প্রতাপ প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষাই মোহ-বন্ধন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যাভাষণ ও কাপট্যই

মোহ-বন্ধন। ইহার জন্য যাহার মন অহ-রহঃ চিন্তারত রহিয়াছে, সুখ শান্তি তাহাকে মরীচিকার ন্যায় ক্ষণিক আশ্বাসে মুগ্ধ করিয়া মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। ইহারই উপা-র্জ্জন মানসে আমরা কি আমাদের অমূল্য বিজ্ঞানাত্মাকে আজীবন নিযুক্ত রাখিব? মৃত্যু কে চায়? অমৃতই সকলের লক্ষ্য। যে দিন ধীশক্তিসম্পন্ন মহামনা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় পত্নীদ্বয়কে তদীয় ধন রত্ন বিভাগ করতঃ গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহার দ্বারা আমি অমর হইব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? আমরা পুরুষ হই-য়াও কি সেই কথা বলিতে পারিব না? ঈশ্বরের চরণে কি বাস্তবপক্ষে—সত্যের জন্য আমাদের মুখ হইতে এই প্রার্থনা-বাণী বাহির হইবে না যে, "হে ঈশ্বর! অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও।" সংসার অন্তঃসার শূন্য অধ্রুব পদার্থ; সুতরাং মৃত্যুরই প্রতি-কৃতি—ইহা অন্ধকারাচ্ছন্ন অসৎ। ঈশ্বর ধ্রুবজ্যোতি সত্য সনাতন পূর্ণ পুরুষ অন্ত-র্বাহ্যে পরিপূর্ণ। তাঁহাকে জ্ঞানযোগে লাভ করা ও তাঁহাতে প্রবেশ করা আমাদের কামনার পরিসমাপ্তি। চর্ম্মচক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞানচক্ষে তিনি প্রকাশিত হন। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ পরীক্ষিত সত্য, ইহা ঋষিদিগের সম্যক আচরণীয় ছিল। এই জ্ঞান ও প্রার্থনার বলেই তাঁহারা ঈশ্বরকে করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বেদ উপনিষদ হইতেই ইহা লাভ করিয়াছি—আত্ম-প্রত্যয় নিয়তকাল এই সত্যের সাক্ষী দিতেছে। ইহাকে কেহ সন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিও না, বধির-কর্ণ হইয়া শ্রবণ করিও না। এখন সকলে একবার আত্ম-মহিমা চিন্তা কর। স্থূল জগৎ হইতে তাহা ভিন্ন, শরীরস্থ হইয়াও শরীর হইতে তাহা ভিন্ন। এই জীবাত্মার মধ্যেই ঈশ্বর পরমাত্মা রূপে স্থিতি করি-তেছেন। তিনিই আমাদের পিতা মাতা সুহৃৎ—"স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" বিশ্বভুবনের সকল সংবাদ একমাত্র তিনিই জানিতেছেন—দণ্ড পুরস্কার দিবার জন্য তিনি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করিয়া ও তাঁহাতেই অবস্থান করিয়া দেবতারা ও পবিত্র মনুষ্যেরা অমৃত পান করিয়া থাকেন। "ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধাম-ন্নধ্যৈরয়ন্ত।" আমরা তাঁহার প্রসাদে পাপ মলিনতাকে আত্মা হইতে যত উন্মো-চন করিতে পারি, ততই তাঁহার সত্ত্বা ইহাতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, ততই তাঁহার পিতৃ-সম্বন্ধ, সখা-সম্বন্ধ, প্রভু-সম্বন্ধ আমাদের সহিত গাঢ়তর হয়, ততই অধিক পরিমাণে তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামিত্ব আমরা লাভ করিতে পারি। ইহা-তেই শাশ্বত আনন্দ, সুখ ও শান্তি।

এখনই তোমরা একবার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখ যে এইরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ও ব্রহ্মের উপাসনারত হইয়া ঈশ্বরকে তোমরা কতটুকু ধারণ করিতে পারিতেছ, আত্মাকে কত উন্নত করিতে পারিয়াছ। এখনই আপনার আত্মাকে উন্নত করিয়া সেই পর-মাত্মার সহিত যোগ কর; নিশ্চয় জানিবে যে, ঈশ্বর হইতে আমরা কেহই কখন বিযুক্ত নহি। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে

মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। আমাদের শরীরের উপাদান জড় হইতে পারে কিন্তু আমাদের আত্মার উপাদান সত্য, আত্মার উপাদান ধর্ম্ম, আত্মার উপাদান জ্ঞান। ধর্ম্মই আমাদের প্রাণ, জ্ঞানই আমাদের সাধন পথের একমাত্র অবলম্বন। আমাদের মধ্যে হয় ত অনেকেই এমন অবিবেকী আছেন যে তাঁহাদের তত্ত্ববিচার নাই, জ্ঞানের সাধনা নাই, যাঁহারা অধ্যাত্ম যোগের মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু আমাদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই যিনি আপ্ত বাক্যের—শ্রুতি বাক্যের উপরে নিঃসংশয় শ্রদ্ধা না রাখেন। সেই শ্রুতিই বলিতেছেন যে "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" এই যে আমাদের জীবাত্মা ইনি দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, শ্রবণ করেন, আঘ্রাণ করেন, আস্বাদন করেন, মনন করেন, বিচার করেন, কর্ম্ম করেন; তিনিই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ স্থিতি করিতেছেন কোথায়? "স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে" সেই পরম অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছেন। অতএব ঈশ্বর হইতে আমাদের বিযুক্তি কোথায়? তাঁহা হইতে আমরা দূরে নহি, তিনি আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে সত্যস্বরূপের উপাসনার সহজ ও সত্য পন্থা আর কি হইতে পারে? হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে যে আচমনের মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাতে তো ঋষিরা এই কথাই বলিতেছেন যে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই আকাশে বিস্তৃত বস্তু সকল যেমন আমরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাই, সেইরূপ পরব্রহ্মকে ঈশ্বরপরায়ণ ধীরেরা একাগ্রচিত্ত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্র দ্বারা আপন আপন আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করেন। যেহেতু আত্মারূপ উজ্জ্বল কোষই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান, প্রতিজনের আত্মাই তাঁহার প্রকৃষ্ট আসন। আত্মজ্ঞানের এই বিমল জ্যোতিতে যাঁহারা পবিত্র তাঁহারা কি আনন্দের উচ্ছ্বাসেই উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে, দেব হইতে কি উৎকৃষ্টতর দেব সহবাসেই উত্থান করেন।

কিন্তু হায়, তাহাদের কি দুর্দ্দশা যাহারা কেবল প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াই ধর্ম্মের বিপরীত পথে পদার্পণ করিয়াছে। সংশয়-তিমিরের মধ্যে পথভ্রষ্ট হইয়া তাহারা কেবল পুনঃ পুনঃ সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রযাত্রী নাবিকের লক্ষ্য যেমন আকাশের ধ্রুবতারা, পরলোকযাত্রী মানবের লক্ষ্য সেইরূপ আপনার অন্তরস্থ জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর হওয়া চাই। যাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না, কেবল পাপকর্ম্মেই মুগ্ধ থাকিল তাহাদের স্বাভাবিক পবিত্রতা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাহারা পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই সর্ব্বদা যত্নশীল। হিংসা এবং প্রতিহিংসার ন্যায় দুর্জ্জয় ব্যাধি আর কিছুই নাই। ইহাতে দয়া, পরোপকার, প্রত্যুপকার প্রভৃতি মানবের সদ্গুণ সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। কিসে কুপ্রবৃত্তি সকল সতেজ হয়, কিসে পাপ বিষয় সকল হস্তগত হয়, তাহারই জন্য তাহারা ব্যস্ত। পাপ হইতে যে প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে তাহা একবারও মনে করে না—মনে করিবে কি, পাপকার্য্য ও পাপচিন্তা করিতে করিতে পাপে তাহারা এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে পাপবোধমাত্রই তাহাদের মনে জাগ্রৎ হইবার অবসর পায় না। পৃথিবীতে যত

ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে সকল সম্প্রদায়ের লোকই স্ব স্ব শাস্ত্রের অত্যন্ত গৌরব করিয়া থাকেন এবং নিজেকে সেই সেই সম্প্রদায়-গত বলিয়া অভিমানে এত স্ফীত হইয়া উঠেন যে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে থাকে। কিন্তু শাস্ত্রীয় সত্যের অনুষ্ঠানে নিজের নিষ্ঠার অভাব দেখিয়া ও স্বীয় কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও কেহ কম্পিত হন না, ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য। কায়িক পাপের মধ্যে জীবের প্রাণহরণ, চৌর্য্য ও পরদার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বাচিক পাপের মধ্যে প্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য ও অনৃত বাক্য জল্পনাও করিতে নাই, চিন্তাও করিতে নাই। পর-দ্রব্য হরণের অভিলাষ ত্যাগ করিতে হইবে এবং কৃতাকৃতের ফল যে অবশ্য-ম্ভাবী তাহা চিন্তা করিবে। গলদেশে যজ্ঞোপবীত বা কণ্ঠীধারণ করিলে কিম্বা কোরাণ বা বাইবেল হস্তে বিচরণ করিলে মানুষ ধার্ম্মিক হয় না। কিন্তু জাতি নির্ব্বিশেষে বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আছে তিনিই ধার্ম্মিক। অতএব হে সাধু সজ্জন সকল! তোমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হও। পাপ করিয়া কুতর্ক দ্বারা আপনাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিও না, মৃত্যুর পরে তোমাদের যে অবস্থা হইবে তাহার প্রতি অন্ধ থাকিও না; কিন্তু সরল হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হও। তোমাদের পাপ তাপ সকল দূরীভূত হইবে, তোমরা পুণ্য পদবীতে ক্রমে উন্নত হইবে এবং পরলোকে দেবতাদিগের সঙ্গে সমস্বরে ঈশ্বরের গুণগান করিতে ও তাঁহার মহিমা গরীয়ান করিতে পারিবে। এখন অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং আপনার চরিত্রকে শোধন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে থাক, পৃথিবীকে শেষ গতি মনে করিয়া যথেচ্ছাচার করিও না। ব্রতহীন স্বেচ্ছাচারী পাপীরা এখান হইতে যে পরিমাণে পরলোক পাপভার লইয়া অবস্থিত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে পাপ প্রতিকারের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়। যেমন হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা যমুনা এখানে আমাদের জন্য সুশীতল বারি আনয়ন করিতেছে, যেমন সুদূর দক্ষিণ আকাশ হইতে স্নিগ্ধ শীতলতা বহন করিয়া মলয় মারুৎ আমাদের মন প্রাণ শীতল করিতেছে, যেমন সমুচ্চ গগন প্রান্ত হইতে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া আমাদিগের চক্ষুতে জ্যোতি দিয়া বর্ণবিধান করিতেছে, সেইরূপ আমাদের যজনীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রাচীন—অতি প্রাচীন বেদ উপনিষৎ হইতে মহাসত্য সকল বহন করিয়া আমাদিগের ধর্ম্মপ্রাণকে পবিত্র করিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আরণ্যক ধর্ম্মকে গৃহে আনিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গুপ্ত তত্ত্বকে সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিয়া জ্ঞানী মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেরই কল্যাণসাধন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি অমৃতবাণীই প্রচার করিয়াছেন!

> ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।
> মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন। জগতের এই অদ্বিতীয় কর্ত্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা,

পরব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, সেইরূপ ওঁ শব্দেরও বাচ্য। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান্ পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোকনিবাসী দেবতারা নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। আমরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে আমাদেরও কর্ত্তব্য যে দেবতাদের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গলস্বরূপের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি করিয়া তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।

ওঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরম-মৃতমভয়ং পরঞ্চ॥

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ওঙ্কার সাধনের দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

হে পরমাত্মন্! যেমন স্বর্গের দেবতারা এক সঙ্গে মিলিয়া অহরহ তোমার স্তুতিগান ও তোমাতে অমৃত পান করিয়া থাকেন, বৈদিক কালে আর্য্য ঋষিরা যেমন অরণ্যে বেদীপীঠে বসিয়া সামগানে তোমার আরাধনা করিতেন, এই বর্ত্তমান যুগের এই ব্রাহ্মসমাজের বেদীপীঠে বসিয়া আমরাও সেইরূপ তোমার স্তুতিগান করিতেছি। হে প্রকাশবান্ পরমেশ্বর! তুমি একবার আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হও এবং আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

মা আমার অনন্ত রত্নের অধিকারিণী। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ কত তাঁর ঐশ্বর্য্য, কত তাঁর বিভূতি। ভূলোক দ্যুলোক চারিদিকেই তাঁহারই ঐশ্বর্য্য দেদীপ্যমান। এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার সমক্ষে দেখিতেছ সকলেরই তিনি অধীশ্বরী, কেবল যে তিনি অধীশ্বরী তাহা নহেন, এই সকলই তিনি প্রসব করিয়াছেন। প্রসব করিয়াছেন কেন? তাঁহার সন্তান সন্ততিদিগের ভোগের জন্য, তোমরা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া কর্ম্মফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ করিবে এই জন্য। তুমি যতই ভোগ কর না কেন, মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় না, কখনও তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, তিনি এতই মুক্ত হস্তে আমাদিগের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। বল দেখি কখন কোন অভাব তুমি মায়ের নিকট জানাইয়াছ, আর তাহা তিনি পূরণ করেন নাই!

মা আমাদের এত ঐশ্বর্য্যশালিনী, আবার তিনি এরূপ দানশীলা, আবার আমরাই এই রাজ-রাজেশ্বরীর প্রজা ও সন্তান। বল দেখি আমাদের মত সৌভাগ্য আর কাহার আছে?

জননী সমান করেন পালন
সবে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর,
দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

কিন্তু আবার দেখিতে পাই কত তপস্যা করিয়া ও কত জ্বালা, যন্ত্রণা, শোক তাপ সহ্য করিয়া সাধক শান্তি না পাইয়া

তাঁহাকে কঠোর নিঠুর বলিয়া, কত আদরের সহিত তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। মা, অবোধ সন্তান আমরা, তোমার এ লীলার যে কিছুই মর্ম্ম পাই না। চাতক একবিন্দু বারির জন্য দে জল, দে জল, বলিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কত চীৎকার করিয়া গেল তোমার দয়া হইল না, আবার কোথাও বা অযাচিত হইয়া অজস্র ধারে বারি বর্ষণ করিতেছ।

আবার দেখি Book of Job নামক গ্রন্থে ভক্ত শিরোমণি "জোব" কেবল বিপদের উপর বিপদ, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা শোকের উপর শোক ভোগ করিয়াও তোমাকে ছাড়েন নাই। চর্ম্ম চক্ষে দেখিলাম বেচারার উপর তোমার দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই। আমাদের ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা কে না জানে। এই সকল যখন ভাবি, তখন এইরূপ হয় কেন সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। তখনই আবার মায়ের অপার অনন্ত করুণা আমাদের স্মরণপথে পতিত হয়। তখন কবির সঙ্গে ভাবি এ সংসার আমাদের আরামের স্থান নহে ইহা কেবল পরীক্ষার ক্ষেত্রমাত্র।

এই সমস্ত বিপরীত ভাবাপন্ন অবস্থার মূল কারণ কি? তিনি আমাদের স্নেহময়ী জননী,আমরা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান। অকারণে আপন সন্তানসন্ততিদিগকে ক্লেশ, যন্ত্রণা দেওয়া কখনই তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা সময়ে সময়ে বুঝিতে পারি না কেন আমরা মধ্যে মধ্যে ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করি; কেন বিষাদে জর্জ্জরীভূত ও শোকে মুহ্যমান হই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয়, এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ দণ্ডভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন। দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়, অনুতপ্ত হইলেই দণ্ড-দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করেন।"

আবার দেখ কেহ কখন চিরকাল দুঃখ বা চিরকাল সুখ ভোগ করে না। এই সংসারে সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।" আবার প্রকৃতির গতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ,দিনের আলোকের পর রাত্রির অন্ধকার, গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতকালের শীত, সুস্নিগ্ধ মলয় সমীরণ ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু এরূপ পরিবর্ত্তন সংসারে সততই ঘটিতেছে। সুখ দুঃখও তদ্রূপ।

আবার দুঃখ ভোগ না করিলে সুখের আস্বাদ কখনই পাওয়া যায় না। যদি কেহ চিরকাল সুখভোগ করিতেই রহিল তবে সুখের মূল্য কি? তাহার আস্বাদনই বা সে কিরূপে জানিতে পারিবে? তুলনা না করিলে মূল্য কিরূপে নিরূপিত হইবে।

এ ত গেল যুক্তি তর্ক, জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা। একবার ভক্তির চক্ষে দুঃখ কি ভাবিয়া দেখ দেখি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বর আমাদের স্নেহময়ী মাতা, আমরা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান। অকারণে আপন

সন্তান সন্ততিকে ক্লেশ দেওয়া কখনই মায়ের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সন্তান কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে পিতামাতা তাহার মঙ্গলের জন্য যেমন তাহাকে তাড়না করেন তদ্রূপ তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে তাড়না করিয়া থাকেন, আমরা যে দুঃখ শোক ভোগ করি সে কেবল আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম করুণার লক্ষণ।

"বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ, মাগো,
সে কেবলই দয়া তব তুমি গো মা দুঃখহরা।
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই দিয়ে বহি মাগো দুখ সুখেরি পশরা।

ভক্তি ভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই। কেবল শুষ্ক জ্ঞান মানবের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না। ভক্তি চিত্তকে বিগলিত করে। ভক্তিযোগই মনুষ্যকে পরব্রহ্মের সন্নিহিত করে। এই ভক্তিযোগ বলেই সাধক চৈতন্যদেব ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং একদা জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে গীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে উপসংহারে তাহার দুই একটি কথার উল্লেখ করিলাম।

যিনি ভূতসকলের প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি সকলেতে কৃপাবান অথচ মমতাহীন এবং অহঙ্কারশূন্য, যিনি ক্ষমাবান, তিনিই যথার্থ ভক্ত।

যিনি লাভালাভ উভয়েই সতত প্রসন্ন চিত্ত এবং অপ্রমত্ত আর যিনি তাঁহার স্বভাবকে বশীভূত করিয়াছেন, ঈশ্বরে যাঁহার দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে যিনি ঈশ্বরে মন বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত।

যাঁহা হইতে প্রাণিগণ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং যিনি স্বাভাবিক হর্ষাদি হইতে মুক্ত এবং যিনি অমর্ষ ত্রাশ ও উদ্বেগ মুক্ত, যাঁহার চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় না তিনিই যথার্থ ভক্ত।

যিনি প্রার্থনা ভিন্ন স্বয়মাগত অর্থেও নিস্পৃহ এবং বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন, যিনি আলস্যরহিত ও পক্ষপাত বর্জ্জিত এবং যিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী তিনিই যথার্থ ভক্ত।

প্রিয় বস্তু পাইয়া যিনি তুষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও যিনি দ্বেষ করেন না এবং ইষ্টার্থ নাশ হইলেও যিনি শোক করেন না, অপ্রাপ্য অর্থে যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই এবং যাঁহার শুভাশুভ পুণ্য পাপ ত্যাগ করিবার অধিকার হইয়াছে তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

শত্রু মিত্রে যাঁহার সমান ভাব, মানাপমান উভয়েতেই যাঁহার সমান জ্ঞান এবং শীতোষ্ণ এবং সুখ দুঃখ হইতে যিনি বিশেষ রূপে সঙ্গবর্জ্জিত তিনিই যথার্থ ভক্ত।

নিন্দা এবং স্তুতি যে ব্যক্তির তুল্য, যিনি যথালাভে সন্তুষ্ট, যাঁহার মতি স্থির এবং চিত্ত বশীভূত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি যথার্থ ভক্ত।

উক্ত প্রকার ধর্ম্মই মোক্ষ সাধন হেতু এরূপ ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রিয়।

হে পরমাত্মন্, হে পতিতপাবন গুরুদেব, ভক্তিযোগ শিক্ষা দেও, যে ভক্তিযোগ দ্বারা তোমার সহিত নিত্য সহবাস লাভ করতঃ অহরহঃ তোমার সেবা ও তোমার চরণে প্রীতি-পুষ্প অর্পণ করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সুরাটে ব্রাহ্মসমাগম।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এ বৎসর সুরাটে (Theistic conference) একেশ্বরবাদিগণের সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় যে গবেষণা পূর্ণ ইংরাজি বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকাশ ও বিশেষত্ব এবং ভারতীয়

প্রাচীনত্বের সহিত উহার যোগ ও ঘনিষ্ঠতা অতি সুনিপুণভাবে ও সংক্ষেপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

'আপনারা যে আমাকে এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম। যখন এই আসন পরিগ্রহ করিবার প্রস্তাব আমার নিকট প্রেরিত হয়, অনিচ্ছা বশতঃ নহে, কিন্তু নিজের ত্রুটিও যোগ্যতার অভাব অনুভব করিয়া প্রথমে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল আমার শক্তি যতই সামান্য হউক না, আমার উপরে গুজরাট প্রদেশের যথেষ্ঠ অধিকার আছে। এই গুজরাট প্রদেশেই আমি আমার কর্ম্ম-জীবনের প্রথম অংশ ক্ষেপণ করিয়াছি, আহমদাবাদের প্রার্থনা-সমাজ সাদরে আমাকে বেদী প্রদান করিয়াছিলেন। আমি আজ বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মসমাজের বার্ত্তা লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, যে জাতীয় ভাবের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা—জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়া উহার বিকাশ।

জাতীয়ভাব এবং সার্ব্বভৌমিকভাব ধর্ম্মের এই দুইটি দিক। প্রতি জাতির ভিতরে যেমন তাহার শিল্প-সাহিত্য ব্যবহার-শাস্ত্র আছে, ধর্ম্মেরও বিকাশ সেইরূপ। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম দেশের মধ্যে প্রচারিত হইলেও, জাতীয় ভাবের সহিত তাহার সকল সংস্রব পরিহার হয় না। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও প্রতি মনুষ্য তাহাকে বিশেষভাবে গঠন করিয়া লয়, অতীতের সহিত তাহাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করে, জাতীয়ভাবে প্রচার করিতে সে বদ্ধপরিকর হয়। ফলতঃ প্রতি জাতির এমন কি প্রতি মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সংস্কার আছে, উহা সে ভূরি দর্শনে ও নিজ জীবনে উপলব্ধি করে; অপরের সহিত যাহার আদান প্রদান আদৌ চলিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম বিদেশ হইতে এদেশে আনীত হয় নাই। কিন্তু অতীতের সহিত ইহা অনুস্যূত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈদিক সময়ের প্রকৃতিপূজার উপরে দৃষ্টি পড়ে। আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আর্য্যেরা তাঁহাদের রচিত সুন্দর গাথায় শত্রু হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্য দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন, বল ভিক্ষা করিতেন। বেদের ভিতরে তিনটি ভাগ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; শ্রুতি বেদেরই নামান্তর মাত্র। শ্রুতির ভিতরে যাহা আছে, বেদরচয়িতাগণ যেন তাহা প্রত্যাদেশ বলে লাভ করিয়াছিলেন। স্মৃতি উহার অপর দিক্ অর্থাৎ যাহা ঋষিরা স্মরণে রাখিয়াছিলেন। যাগযজ্ঞ, বেদের ব্যাখ্যা ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদি লইয়া সূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস স্মৃতির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

বেদের ভিতরে প্রতিমাপূজা নাই, সেখানে নরকের ভীষণ চিত্র নাই, জাতিভেদের কঠোরতা নাই, ভূত-প্রেতের বিভীষিকা নাই। জগতের বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় ঋষিরা বিস্ময়বিমুগ্ধ। তাঁহাদের ধর্ম্মের আর একটি দিক ছিল, তাঁহারা যাগযজ্ঞনিরত ছিলেন, বেদে ইহারই পরিচয় মিলে। তাঁহারা এই বিশ্বাসে বলি প্রদান করিতেন, যে দেবতারা বলির বিনিময়ে তাঁহাদিগকে ধন দিবেন। সোমযাগের জন্য তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধি মানিয়া চলিতেন। ক্রমে তাঁহাদের অর্চ্চিত মেঘ বিদ্যুতের প্রাচীন দেবতাগণ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিল, তাঁহারা কালসাধ্য যাগ ও কৃচ্ছসাধনসাপেক্ষ যাগযজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। বেদের ভিতরে কোন এক বিশেষ দেবতার সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন নাই, সকল দেবতাই প্রধান। ক্রমে এক ঈশ্বরের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভিতরে বিভিন্ন দেবতার বিদ্যমানতা ছিল বটে, কিন্তু দেবতারা স্বস্ব প্রধান, তাঁহারা এক দেবতার অর্চ্চনা করিতে গিয়া অপর দেবতাগণকে অস্বীকার করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা এক ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়া বলিয়া উঠিলেন

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। ইন্দ্রং, যমং, মাতরিশ্বানমাহুঃ।

এক ঈশ্বরকেই পণ্ডিতেরা বহু করিয়া বলেন, কেহ বা ইন্দ্র, কেহ বা যম, কেহ বা মাতরিশ্বা (বায়ু) কহেন।

মিত্র ও বরুণ ইহাদের প্রভুত্ব সকলেরই উপরে। তাহারা ঋতের দেবতা, উহার সারথি ও পথপ্রদর্শক। বরুণ দেবতা সকলই দেখেন, সকলই জানেন, সকলকেই শাসন করেন; তাঁহার নিকট কেহই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। যে কেহ পাপ করে, বরুণ তাঁহার শাস্তি বিধান করেন। দয়াময় ও ক্ষমাশীল দেবতা তিনি।

বেদের ভিতরে বরুণের প্রতি একটি সুন্দর প্রার্থনা আছে। অনুবাদ এই—

১। বায়ু-চালিত মেঘের ন্যায় যদি আমি চঞ্চল ভাবে ধাবিত হই, তবে হে সর্ব্বশক্তিমন্! আমাকে কৃপা কর, আমাকে কৃপা কর।

২। দীনতাবশতঃ আমি প্রতিকূলে উপনীত হইয়াছি, হে ঐশ্বর্য্যবন্, নির্ম্মল পুরুষ, আমাকে কৃপা কর, হে ঈশ্বর! আমাকে কৃপা কর।

৩। জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা আক্রমণ করিয়াছে। কৃপা কর, হে ঈশ্বর, আমাকে কৃপা কর।

৪। হে বরুণ, যখন আমরা দেবতাদিগের সমক্ষে বিদ্রোহাচরণ করি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার ধর্ম্মলঙ্ঘন করি, তখন হে দেব! সেই পাপ হেতু আমাকে বিনাশ করিও না; আমাকে ক্ষমা করিও।

৫। হে বরুণ, আমার ভয় দূর কর। হে সত্যবন্ সম্রাট্, আমার প্রতি কৃপা কর। গোবৎসের বন্ধনের ন্যায় আমার পাপ সকল বিমোচন কর। তোমাকে ছাড়িয়া কেহ এক নিমেষ কালেরও প্রভু নহে।

৬। যাহারা তোমার প্রিয়কার্য্য-অননুষ্ঠানজনিত পাপে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে তোমার যে সকল অস্ত্র তোমার ইচ্ছামাত্র হনন করে, হে বরুণ সে অস্ত্র সকল আমার প্রতি নিক্ষেপ করিও না। আমাকে জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসিত করিও না। হিংসুকদিগকে দূর করিয়া দাও, যাহাতে আমি জীবন ধারণ করিতে পারি।

৭। পুরাকালে তোমার স্তবগান করিয়াছি, অদ্যাপি তোমার স্তবগান করিতেছি, আগামী কালেও হে সর্ব্বপ্রকাশ! তোমার স্তবগান করিব। হে দুর্দ্ধর্ষ!

তোমাকে আশ্রয় করিয়া অটল ধর্ম্মনিয়ম সকল যেন পর্ব্বতে খোদিত হইয়া রহিয়াছে।

৮। আমার কৃত পাপ সকল দূর করিয়া দাও, রাজন্, অন্যকৃত পাপের ফলও যেন আমাকে ভোগ করিতে না হয়। অনেক উষা এখনো অনুদিত রহিয়াছে। হে বরুণ! সেই সকল উষায় জীবিত রাখিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দাও।

মৃত্যুর পরে মনুষ্যের দশা কি হইবে, ইহা সকল যুগেরই জটিল সমস্যা। বৈদিক সময়ে যম পরলোকের পথ প্রথম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। উল্লেখ আছে, যাহারা সৎকর্ম্মশীল, যাগযজ্ঞরত, দানশীল, যোদ্ধা, ঋষি, তাঁহারাই সুখদ স্বর্গে যাইতে সক্ষম। সেখানে যম দেবতা ও পিতৃগণসহ বাস করেন। আর্য্যেরা সকলেই স্বর্গকামী ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরে চির বিশ্রাম লইবার জন্য লালায়িত হইলেন। সোমের উদ্দেশে ঋগবেদের ভিতরে "যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতং" যে মন্ত্র আছে তাহার অনুবাদ এই—

চির আলোক ও অনির্ব্বাণ সূর্য্যের বিকাশ যেখানে, সেই অমৃতলোকে, হে সোম! আমাকে লইয়া চল। বিবস্বতের পুত্র যেখানে রাজত্ব করে, প্রচ্ছন্ন স্বর্গ যেখানে, সমুদ্র যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর। তৃতীয় স্বর্গ, জীবন প্রমুক্ত যেখানে, অনন্ত গ্রহাদি যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর। সকল ইচ্ছা সকল কামনা যেখানে, সোমের পাত্র যেখানে, খাদ্য ও আনন্দ যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর। শান্তি ও আনন্দ যেখানে, হর্ষ ও উল্লাস যেখানে, ইচ্ছার পরিসমাপ্তি যেখানে, সেখানে আমাকে অমর কর।

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি জীবন্ত ভাবে ঋষিদিগের নেত্রে নিপতিত হইত। ঋষিরা মেঘ ও বায়ুর ভিতরে ঈশ্বরের সত্বা অনুভব করিতেন। ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ, তাঁহারা বৃষ্টি অগ্নি বায়ু ঝটিকা ও সূর্য্যেতে দেখিতে পাইতেন। এই সকল বিভিন্ন প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধনায় এবং আপনাদের ঐহিক কল্যাণ মানসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তাঁহাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল এবং তাঁহারা হোম যাগাদির বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইরূপে যাগযজ্ঞাত্মক কর্ম্মকাণ্ড ঋষিদিগের অর্চ্চনা ও স্তুতিগীতের স্থান অধিকার করিয়াছিল। বেদের মন্ত্রভাগের পরে ব্রাহ্মণভাগের এইরূপে উৎপত্তি। ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে যে অংশ অরণ্যের সন্ন্যাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, আরণ্যক বলিয়া তাহা অভিহিত। উহাকেই উপনিষদের নামান্তর বলা যাইতে পারে। উহাই জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড হইতে উহা বিভিন্ন। বাহিরের দিকে দৃষ্টি যতই ক্ষীণ হইতে থাকে, অন্তর্জগতের ভাব ততই জাগিয়া উঠিতে থাকে। যাগযজ্ঞাদির পরিবর্ত্তে সাধনাপ্রভাবে ঈশ্বরের নিকটে যাইবার ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা বলবতী হয়। আমরা এই সময়ে ধর্ম্মের দুইটি ভাব দেখিতে পাই। সংসারীর পক্ষে কর্ম্মমার্গ, সংসারত্যাগীর পক্ষে জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানমার্গীর নিকটে আত্মতত্ত্ব বিকশিত। পরন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার চিন্তনে দ্বৈতভাব ক্রমে ঘুচিয়া গিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাব আসিয়া পড়ে। উপনিষদের অধিকাংশে এই একীভাব উপদিষ্ট।

উপনিষদের কথা এই যে আপনাকে জান। আপনার ভিত্তিকে অনুসন্ধান কর। তিনি এক, যিনি সমগ্র জগতের অন্তঃস্তলে রহিয়াছেন। বেদের সর্ব্বপ্রাথমিক বাদনগীতি হইতে উপনিষদের যে গুরুগম্ভীর পরিণতি, তাহাই বেদান্ত বলিয়া খ্যাত।

উপনিষদের ঋষিরা কবি ছিলেন। তাঁহাদিগকে ঠিক দার্শনিক বলা যাইতে পারে না। এই কারণে উপনিষদের ভিতরে ধারাবাহিক ভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদ নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদের আকর নহে। ঈশ্বরবাদের প্রতিপোষক অনেক শ্লোক উহা হইতে বাহির করা যাইতে পারে। বেদের ভিতরে তেত্রিশটি দেবতা পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উপনিষদে একই দেবের প্রতিষ্ঠা—

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ আদিত্যে স একঃ।

যিনি সূর্য্যে, যিনি মনুষ্যের আত্মাতে, তিনি এক। প্রকৃতির সকল দেবতা যে সেই ব্রহ্ম হইতে শক্তি লাভ করে, উহা কেনোপনিষদে বিবৃত আছে। ব্রহ্মের অধিষ্ঠানেই অগ্নি তৃণখণ্ডকে ভস্মসাৎ করে, বায়ু তাহাকে পরিচালিত করে। তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইলে সকলই শক্তিহীন। কঠোপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়াতপ বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি"। শ্বেতাশ্বতরে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" এই শ্লোকে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মই স্রষ্টা; তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলই প্রসূত হইল। তিনিই বিশ্বের পালক ও রক্ষক, এই হেতু তিনি ঈশ্বর—ধাতা। "যো দেবোঽগ্নৌ" ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাই এত আনন্দ। তাঁহার আনন্দের কণামাত্র অন্যান্য জীব সকল সম্ভোগ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদি শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গার্গীর কথোপকথনে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার পূর্ণ পরিচয় মিলে। সকল লোক ও গ্রহ নক্ষত্রাদি বিচূর্ণ হইয়া না যায়, তাই তিনি সেতু বলিয়া উপনিষদে চিত্রিত। তিনি 'কবির্মনীষী পরিভূঃ' সর্ব্বজ্ঞ মনিষী, তিনি সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি সকলের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিতেছেন। উপনিষদ পাঠে মোহিত বিখ্যাত দার্শনিক সোপনহর Scopenhauer) বলেন "সমুদয় পৃথিবীতে উপনিষদের মত কল্যাণদ ও মনের উৎকর্ষবিধায়ক গ্রন্থ নাই; জীবনে ইহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুতেও সান্ত্বনা দিবে।"

আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক অন্ন যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের বিলক্ষণ পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ উপনিষদেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই উপনিষৎ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিরা অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মের সাধন ও তপস্যা করিতেন। কিন্তু আমরা সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে চাই। যে ধর্ম্ম জীবনকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিতে পারে, যে ধর্ম্ম সৎ পিতা স্নেহশীলা মাতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, বিশ্বস্ত স্বামী ও অনুকূলা স্ত্রী হইতে

শিক্ষা দেয়, আমরা সেই ধর্ম্মেরই ভিখারী, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহার লক্ষণ কি ?

১ম। এক জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা, প্রতিমা বিসর্জ্জন এবং বহু ঈশ্বরের স্থানে এক ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা।

২য়। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, মধ্যবর্ত্তিত্বের সম্পূর্ণ অভাব। ঈশ্বরকে আত্মার গভীরতম প্রদেশে মধ্যে অনুভব করা।

ঈশ্বরের বাণী নিজ কর্ণে শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতে হইবে। গুরু বা কোন মধ্যবর্ত্তী লোক তোমার জন্য মুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে না। সকল ধর্ম্ম-প্রবক্তাগণকে আমরা সম্মান করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিব না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই ধর্ম্মের জন্য পিপাসা আছে। সে আপানার ধারণানুরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা করে। যাঁহারা জগতের পরিত্রাতা বলিয়া গণ্য,তাঁহারা আর যাহা করুণ কিন্তু তাঁহারা নিজে আমাদিগের জন্য মুক্তি আনিয়া দিতে পারে না। একজন অন্যকে মোক্ষ আনিয়া দিতে পারে না। আমার নিজের মুক্তি নিজেরই চেষ্টাই সাপেক্ষ। যখন বুদ্ধদেব সাংঘাতিক রোগে পীড়িত, তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ বুদ্ধদেবকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যথার্থই বলিয়াছিলেন,তোমরা নিজেই তোমাদের আলোক, তোমরা নিজেই তোমাদের গতি; বাহিরের আশ্রয়ের প্রয়াসী হইও না। ঈশ্বরের সমীপে নিজে নিজে বল যে হে পরমাত্মন ! অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, আমার নিকট প্রকাশিত হও। ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং আমরা তাঁহার পুত্র। ঈশ্বরের আদেশ—তাঁহার বাণী কোন বিশেষ দেশ বান কোন বিশেষ কালে নিনাদিত হয় না। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে আমরা বিমুখ নহি। সার্ব্বভৌমিক সত্যধর্ম্ম আমাদের। ভবিষ্যতে এ ধর্ম্ম সমস্ত জগতের ধর্ম্ম হইবার অধিকারী। অভ্রান্ত বলিয়া কোন ধর্ম্মকে বা ধর্ম্মপ্রচারককে বা ধর্ম্ম-সমাজকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া ধারণা করিতে গেলে সত্য হইতে মন সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, চিন্তার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। হিতাহিত জ্ঞান ও সদসৎ বিবেচনার নিকট সত্য পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিব। ঈশ্বরকে পাইবার পন্থা নিজেকেই অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে। মানব প্রকৃতি মূলক অভ্রান্ত ও অবিচলিত সত্যের উপরে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

সর্ব্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে যে একেশ্বরবাদী যাঁহারা, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া একত্রে কার্য্য করুন। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্য-সমাজ সকলে মিলিয়া মিথ্যা-দেবতা ভ্রান্ত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন। ইহাদের মধ্যে অনেকাংশে বিশ্বাসের একতা আছে। সকলেই ঈশ্বরকে রাজা ও পিতা বলিয়া স্বীকার করেন, মনুষ্যের ভ্রাতৃসম্বন্ধে বিশ্বাস করেন, নিজবলে মুক্তিলাভের জন্য সকলেই লালায়িত, কর্ত্তব্য সাধনে সকলেই গৌরব অনুভব করেন, পবিত্রতালাভের জন্য সকলেরই চেষ্টা।

পণ্ডিত মোক্ষমূলার তাঁহার Sacred-Books of the East গ্রন্থে একস্থানে বলিয়াছেন, আজকালকার দিনে ইহাই বিশেষ শিক্ষনীয়, যে বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে আসল কোনটুকু, কোন্টুকুই বা বাহিরের আবরণ, কোন্টুকুই বা স্বর্গীয়ভাব, কোন্টুকুই বা মানবের মনঃকল্পিত, তাহা নির্ব্বাচন করা।

সকল শাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান সেই একই ঈশ্বর। যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের ভাবুক ও উপাসক, তাঁহার মুখ দিয়া সেই পরিমাণে সত্য বিনির্গত হয়। বিভিন্ন জাতির ভিতরে যে কোন সাধু আপনাকে পবিত্র করিতে পারিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা কোন দেশে বা কালে বদ্ধ নহে। ধর্ম্মমাত্রেরই মূল উপাদান এক, জ্ঞানের তারতম্যবশতঃ প্রকরণ ভেদমাত্র। ভ্রাতৃগণ আমাদিগকে উদার হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণমনা হইয়া অপরের ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" ঈশ্বর অভয়-বানীতে সকলকে বলিতেছেন, যে যে ভাবে আমাকে পূজা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করি ; কিন্তু সর্ব্বশেষে সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

আসন পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে জানাইতে চাই, যে কলিকাতায় ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলে উহার উন্নতি কল্পে মুক্তহস্ত হউন। আপনারা স্থিরভাবে যে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, ইহার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদের সমক্ষে বর্ত্তুল গড়াইয়া দিলাম, আপনারা ইহাকে আরও অগ্রসর করিয়া দিন, যে পর্য্যন্ত না ইহা আমাদিগকে সম্মিলনের ভূমিতে লইয়া যায়।

নানা কথা।

সুরাট।—নানা কারণে সুরাটে কনগ্রেস বিভ্রাট ঘটিলেও সুরাটে Theistic conference একেশ্বরবাদী সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর, জজ চন্দাভার্কার, দামোদর দাস, গোবর্দ্ধন দাস, রাওবাহাদুর উমিয়াশঙ্কর, রমনভাই মহিপতরাম,প্রকাশ রাও, সায়েদ আবদুল কাদের,খ্যাতনামা দেশবিদেশস্থ একেশ্বরবাদী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই প্রার্থনা-সমাজের স্বামী সত্যানন্দ ৯ই পৌষ সন্ধ্যায় প্রারম্ভিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরদিন প্রাতে বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এই যে "অনেকে নানা উদ্দেশে সভা সংস্থাপন কারন, কিন্তু আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ নূতন। আমরা ঈশ্বরের দ্বারেই দেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। প্রকৃতভাবে ব্যক্তিগত জাতিগত সর্ব্ববিধ উন্নতির উৎস ভগবান। তিনিই আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন, যদি আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস রাখিয়া, পরস্পরকে প্রীতি করিয়া আত্মত্যাগের ভাবকে জাগাইয়া তুলিতে পারি।" ঐ দিন সন্ধ্যায় সুরাট টাউনহলে আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজের সভা-

পতি শ্রদ্ধের উমিয়াশঙ্কর সমাগত সভ্যগণকে সাদরে গ্রহণ করিলে দামোদর দাসের প্রস্তাবে ও প্রফেসর রুচিরামের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ আমরা অন্যত্র সন্নিবেশিত করিলাম। উহা সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

উদারতা।—মহারাজা গাইকবাড়, বরোদার একটি প্রাচীন মস্‌জেদের সংস্কারের জন্য ২৩০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা তাঁহার বিরাট ও উদার হৃদয়ের পরিচয় বলিতে হইবে। প্রবুদ্ধ ভারত,ডিসেম্বর, ১৯০৭।

দীক্ষা।—এটোয়া জেলার অন্তর্গত বুণ্টায়া নামক স্থানে বিগত ৬ই নবেম্বর রাজপুত শুদ্ধি-সভার এক অধিবেশন হয়। ৩৭৫ জন রাজপুত্তকে, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে মুসলমান ধর্ম্মে জোর করিয়া দীক্ষিত হইয়াছিল প্রায়শ্চিত্তান্তে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হয়। সমবেত প্রায় ৮০০ শত ব্যক্তি নবদীক্ষিতগণের সহিত আহারাদি করেন। বুণ্টায়া সহরের রাজপুতেরা তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। বিলাতপ্রত্যাগত কৃতবিদ্য শত শত যুবাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজ দিন দিন কি দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছেন না। হায়! জ্ঞানোন্নত বঙ্গে যাহা না ঘটিল অন্যান্য প্রদেশে সে সংস্কার সহজেই ঘটিতেছে। আমাদের লজ্জার কথা বলিতে হইবে। প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর ১৯০৭।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, অগ্রহায়ণ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৩৪ ৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮৫৪৸৶০
সমষ্টি	...	৩১৮৯৲
ব্যয়	...	৩৬৪। ৬
স্থিত	...	২৮২৪॥৶৬

আয়।

সম্পাদক [illegible]য়রবাটীতে গচ্ছিত
অদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২২৪॥৶৬

২৮২৪॥৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২০৭॥০

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে
প্রাপ্ত মাসিক দান

২০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
প্রথম পুত্রের অন্ন-প্রাশন উপলক্ষে
১ খণ্ড হাফ্ গিনি

৭॥০

২০৭॥০

তত্ত্ববোধিনা পত্রিকা	...	২৩।০
পুস্তকালয়	...	৭॥০
যন্ত্রালয়	...	৮৫৸৶০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১০৲
সমষ্টি	...	৩৩৪৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৫॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২০৸৶৬
পুস্তকালয়	...	৶০
যন্ত্রালয়	...	১৬৭॥৶০
সমষ্টি	...	৩৬৪।৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৬ই মাঘ সোমবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের তিরোভাব উপলক্ষে তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইবে।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি-ব্রাহ্মসমাজের অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতঃকালে এই বক্তৃতা পাঠ করেন।

দুঃখ।

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনি আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই, তখনি এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহবা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি—কেহবা তাহাকে জন্মান্তরের কর্ম্মফল বলিয়া জানি—কিন্তু তাহাতে দুঃখ ত দুঃখই থাকিয়া যায়!

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই ত দুঃখ, এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্য্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর একটী প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে ত প্রকাশ পাইতেই পারেন না;—এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলি ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়!

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই,

সেই কর্ম্মক্লেশের মধ্যে অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কি করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপন পরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা যেগুলি আহত প্রতিহত হইতেছে, সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রস-স্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই ত তিনি রস। তাঁহাকে ধরিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেই জন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃত রূপ।

সেই জন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্ব্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেই জন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই, তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জ্জনতার মধ্যদিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কি বলিব, এ কি হইতেছে! নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই ত সব বলা হইল না—এমন কি কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য্য শক্তি ও আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের কি বলা হইল? সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সঙ্গীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীর ভাবে ব্যক্ত করিতেছে? এত কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কি? তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্ তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও

এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—কষাহত কালো ঘোড়ার মসৃণ চর্ম্মের মত নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তারপরে সেই জলস্থল আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ মধ্যে জড়িত আবর্ত্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশেহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধূলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই ত রস। ইহাত শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে—ইহাই বীণার সঙ্গীত। এই সঙ্গীতেই আনন্দের পরিচয়—সেই আনন্দরূপমমৃতম্!

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্ররূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্ব্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া? এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড় রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে? না, পরিবেষণের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব হোক্ হোক্ কঠিন হোক্, কিন্তু ইহাকে ভরপূর করিয়া দাও; আনন্দ ছাপাইয়া উঠুক্।

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কি করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকার অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনো দিনই আনন্দলোকের ধ্রুব-দীপ্তি দেখিতে পায় নাই—হঠাৎ কি কখনই বলিয়া উঠে নাই—বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি—আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই? সেই দিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই "যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম," অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব! ইহা কি তর্কের বিষয়, ইহা কি আমাদের উপ-

লব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে—আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্ব্বলতাবশত খর্ব্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড় করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ; দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে ত তাহার নহে—সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের—কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্য্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্ব্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ। সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কি দিব, কি দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া ত তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন—নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্ খানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কি করিয়া? এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার, বর্ষণ করিবার, প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড় অভিমান; এই খানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্য্যে আমার ঐশ্বর্য্যে যোগ—এই খানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্য্যনক্ষত্রখচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা। হঠাৎ যখন অর্দ্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জ্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠে—তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি,—হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি;—সেদিন যেন দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া

বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়ত অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখ দুঃখ ত কেবলি নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই ত সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্য কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে, যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ মারী অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়, যেখানে রক্ত সরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমুর্ত্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানব হৃদয়কে বারম্বার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান্ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না —সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন মানুষের চিত্তে দুঃখও সেইরূপ। তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব সমাজে নূতন নূতন কর্ম্মলোক ও সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব সংসারের সমস্ত বায়ু-প্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্ব্বল ভাবে দেখিব না, আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থ ভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারা যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেই জন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন

আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্য্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন—তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্য্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জ্জিত বলিতে পারি না—সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই;—ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎ সংসারে আমাদের সমস্ত দাবী চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোন দলিল থাকে না;—আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব—মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মত এত বড় অভাব আর কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড় দুঃখকে বহন করিবে কে? কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়, তাহার আনন্দও তত খানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞান লাভ, এবং প্রেমিকের প্রিয় সাধনাও তাই।

খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসঙ্গমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খৃষ্টান ধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে মূর্ত্তিকে বাহ্যতঃ কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। সংহার-রূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্য্যই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়ই সকরুণ, বড়ই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেই জন্যই এই সকল দুর্ব্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। তুমিই

> লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
> লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
> তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
> ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ॥

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎবদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ—সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া হে বিষ্ণু তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মত সঙ্কুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি—তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি—তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্ব্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না;—

তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ—সেই যে উদ্ধারের পথ সে ত আরামের পথ নহে সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও—হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ ত সহজ নহে! এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ! অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্ম্মে, মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এই রূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন, রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে, —তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন্ দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে—যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্ম্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়' বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্য্যোগে, হে রুদ্র,তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ ও মৃত্যু, বিঘ্ন ও বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দ-ভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাবিশ্রাম নাই। হে ভয়ঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর, হে শঙ্কর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্ব্বাদ কর! জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধন সম্পদকেই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন এক মুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিবে তখনি হে রুদ্র সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দ্দিনকে আমরা

যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হৌক্, এবং শোক-আমাদের মুক্তির কারণ হৌক্, এবং লোক-ভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হৌক্। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

সহজ-জ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি গোড়ার সংস্কার।

প্রথম পরিচ্ছেদের

অনুবৃত্তি।

শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা এই দুই শব্দ সকল ভাষাতেই আছে। এই দুই বিশ্বজনীন শব্দ অপক্ষপাতীভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহার মূলে কতকগুলি উচ্চভাব নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নিজের কাজে স্বাধীন নহে, যাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই, ভাল কাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এ কথা যে বুঝে না, সে কি শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে? মানিয়া লও, মন্দের সহিত ভালোর আসলে কোন প্রভেদ নাই; মানিয়া লও, এ সংসারে অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে উপলব্ধ স্বার্থ বই আর কিছুই নাই, প্রকৃত কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই, এবং মনুষ্য স্বাধীন জীব নহে;—এরূপ মানিয়া লইলে কেহ কি ন্যায্যরূপে শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে?

শ্রদ্ধা-তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করিলে, উহার মধ্যে একটি গভীর ও উদার তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধাভাবের দুইটি লক্ষণ সুনির্দ্দিষ্টঃ—প্রথম, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা অনুভব করে, তাহার মনের ভাবটি নিঃস্বার্থ; দ্বিতীয়, শুধু নিঃস্বার্থ কার্য্য সম্বন্ধেই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্বার্থমূলক সংকল্পের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হয় না; কোন কার্য্য সফল হইয়াছে বলিয়াই তৎপ্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হয় না; কাহারও কার্য্যে সফলতা দেখিলে বরং আমাদের ঈর্ষার উদয় হইতে পারে; উহা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না; উহা আর এক দরের কাজ।

পরিমাণ বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে এই শ্রদ্ধাই ভক্তি হইয়া দাঁড়ায়; এই পবিত্র শব্দটিকে যতই সূক্ষ্মভাবে, যতই স্থূলভাবে বিশ্লেষণ কর না কেন, ইহাকে স্বার্থ ভাবের কোটায় কখনই আনিতে পারিবে না; ভাগ্যবানের সফল কার্য্যের সম্বন্ধেও উহার প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ধর, আর দুইটি শব্দ,—গুণমুগ্ধতা (admiration) ও ধিক্কারবুদ্ধি (indignation)। শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা—কতকটা বিচারমূলক; গুণমুগ্ধতা ও ধিক্কারবুদ্ধি—এই দুইটি, ভাবের কথা; কিন্তু এই ভাবও বিচার বিবেচনার সহিত জড়িত। এই গুণমুগ্ধতার ভাবটি আসলে, নিঃস্বার্থ বিষয়ের সম্বন্ধে কিংবা

নিঃস্বার্থ ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধেই শ্লাঘা (admiration) জন্মাইতে পারে; কিন্তু এরূপ সামর্থ্য কি কোন প্রকার স্বার্থের আছে? তোমার যদি কোন স্বার্থ থাকে, তবে তুমি গুণমুগ্ধতার ভান করিতে পার, কিন্তু আসলে তুমি গুণমুগ্ধ হও না। কোন অত্যাচারী রাজা, মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাইয়া, তাঁহার প্রতি স্তবস্তুতি করিতে তোমাকে বাধ্য করিতে পারেন, কিন্তু আসলে তোমাকে গুণমুগ্ধ করিতে পারেন না। স্নেহ-অনুরাগ হইতেও গুণমুগ্ধতা উৎপন্ন হয় না; এক-জন শত্রুর আচরণেও যদি আমরা কোন বীরত্বের লক্ষণ দেখি, তাহা হইলে আমরা মনে মনে তাহাকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারি না।

এই গুণমুগ্ধতার উল্টা ধিক্কারের ভাব। এই গুণমুগ্ধতাকে যেমন বাসনা বলা যায় না, সেইরূপ তীব্র ধিক্কারের ভাবকেও ঠিক্ ক্রোধ বলা যায় না। ক্রোধ জিনিসটা নিতান্তই ব্যক্তিগত; আমাদের নিজের স্বার্থের সহিত ধিক্কারবুদ্ধির অব্যবহিত সম্বন্ধ নহে; আমাদের কোন বিশেষ অবস্থা ও কার্য্যের মধ্য হইতে এই ধিক্কার উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু উহার মূলে যে ভাব অবস্থিত তাহা নিঃস্বার্থ। ধিক্কারবুদ্ধির মধ্যেও একটা উদার ভাব নিহিত আছে। যদি আমার প্রতি কেহ অবিচার করে, তাহার উপর আমার ক্রোধ ও ধিক্কার উভয়ই উপস্থিত হয়; আমার নিজের ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া তাহার উপর ক্রোধ হয়, এবং আমার স্বজাতি মনুষ্যের উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া তাহার উপর আমার ধিক্কার জন্মে। আমার নিজের উপরেও ধিক্কার জন্মিতে পারে। যাহা কিছু ন্যায় বুদ্ধিকে ব্যথিত করে তাহারই উপর ধিক্কার জন্মে।

আমাদের মর্য্যাদা—আমার নিজের মর্য্যাদা—মানবজাতির মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া যে কোন কাজ করা যায় তাহার জন্যই আমাদের ধিক্কার জন্মে। শুধু কাহা-রও কার্য্যের সফলতা দেখিয়াই যেমন আ-মরা তাহার শ্লাঘা করি না, সেইরূপ, শুধু অনিষ্টের পরিমাণ দেখিয়াই কাহার উপর আমাদের ধিক্কার জন্মে না। একটা প্রয়ো-জনীয় বস্তু লাভ করিলে, আমরা আনন্দিত হই; কিন্তু তজ্জন্য, আপনার উপর কিংবা সেই জিনিসের উপর আমাদের শ্লাঘা জন্মে না। যে প্রস্তরখণ্ড হইতে আমরা আঘাত প্রাপ্ত হই, সেই প্রস্তরখণ্ড আমরা সরোষে ঠেলিয়া ফেলি, কিন্তু তজ্জন্য তাহার উপর আমাদের ধিক্কার জন্মে না।

এই গুণমুগ্ধতা আমাদের মনকে উন্নত করে—বড় করিয়া তোলে। মঙ্গল-আদ-র্শের সন্নিকর্ষে ও সংস্পর্শে মানবপ্রকৃতির মহৎ অংশগুলি যেন সমস্ত নীচতা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উন্নতভাব ধারণ করে। এই-কারণেই এই গুণানুরাগ স্বয়ং হিতকর হই-লেও, উহার পাত্রাপাত্র সম্বন্ধে কখন কখন আমরা ভ্রমে পতিত হয়। অবিচারের আঘাতে আমাদের মন যখন ব্যথিত হয়, তখনই মনের মহৎভাবগুলি বিদ্রোহী হইয়া সুতীব্র ধিক্কারের রূপ ধারণ করে, এবং প্রপীড়িত মানব-মর্য্যাদার দোহাই দিয়া, উহা উন্নত মস্তকে অবিচারের প্রতি-বাদ করে।

দেখ, কর্ম্মী পুরুষেরা, স্বজাতীয় রাষ্ট্রিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য কত না ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। লোকমতের অসীম ক্ষমতা। ইহা নিছক অভিমানমূলক,—একথা বলিয়া ই-হার সম্যক ব্যাখ্যা করা যায় না। কতকটা ইহার মধ্যে অভিমান আছে বটে, কিন্তু

আসলে ইহার মূলে একটি গভীরতর উন্নততর ভাব নিহিত। আমরা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের ন্যায় সকল মনুষ্যেরই ভাল মন্দের জ্ঞান আছে, সকলেই পাপ পুন্যের প্রভেদ বুঝিতে পারে, সকলেই গুণের উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়, গুণের অপকর্ষে ধিকার বোধ করে। সকলেই পাত্র-বিশেষকে শ্রদ্ধা করে, ঘৃণাও করে। এই মনোবৃত্তিটি আমাদের মধ্যে আছে; এই মনোবৃত্তি-সম্বন্ধে আমাদের আত্মজ্ঞানও আছে; আমরা জানি, আমাদের ন্যায় এই মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান অন্য লোকেরও আছে, তাই এই মনোবৃত্তির সংহত শক্তির নিকটেই আমরা ভয়ে সঙ্কুচিত হই। আমাদের ব্যক্তিগত নিজের বিবেকবুদ্ধি স্থানান্তরিত হইয়া যখন সাধারণ লোকালয়ে প্রবেশ করে, তখনই উহা লোক-মত হইয়া দাঁড়ায়। এবং সেই খানে গিয়া, প্রসন্ন ভাব ত্যাগ করিয়া দুর্দ্দান্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। আমাদের নিজের মনে যাহা আত্ম-গ্লানিরূপে দেখা দেয় তাহাই আমাদের সৃষ্ট দ্বিতীয় মনটিতে—অর্থাৎ লোক সাধারণের মনে, ধিক্কাররূপে আবির্ভূত হয়। ইহাই লোকমত। লোক-মত লোকের নিকট যে এত আদরনীয়, এত মধুর ইহাই তাহার কারণ। আমরা কোন ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আরও দৃঢ়নিশ্চিত হইতে পারি যদি আমাদের নিজের বিবেকবুদ্ধির অনুমোদনের সঙ্গেসঙ্গে, আমাদের স্বজাতির সাধারণ বিবেকবুদ্ধিও সেই সম্বন্ধে অনুকূল সাক্ষ্য প্রদান করে। লোকমতের বিরুদ্ধে কেবল একটা জিনিস আমাদিগকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে; কেবল একটা জিনিস আমাদিগকে লোকমতের উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে—উহা কি? না আমাদের বিবেকবুদ্ধির সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত সাক্ষ্য। কারণ, লোকসাধারণ কিংবা সমস্ত মানবমণ্ডলী শুধু আমাদের বাহ্য অনুষ্ঠান দেখিয়াই অগত্যা বিচার করে; পক্ষান্তরে, যাহা সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে ধ্রুবনিশ্চিত, আমরা সেই আত্মজ্ঞানের দ্বারা আপনাকে বিচার করি।

(ক্রমশঃ)

আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার ধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—অথচ এ ধর্ম্মের প্রচার যতটা প্রত্যাশা করা যায় তা হয় না কেন?

তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে আপনাকে সেই ধর্ম্মের উপযুক্ত করিবার জন্য যে সাধন চাই—যে সকল উপকরণ আবশ্যক তাহা আমাদের নাই। আমরা সে ধর্ম্মের ফললাভের জন্য আপনার হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারি নাই।

১। আমাদের আধ্যাত্মিকতার অভাব। ব্রহ্মপূজার দুই আদর্শ, এক হীনতর এক উচ্চতর আদর্শ; আমরা হীনতর আদর্শ গ্রহণ করি। হীনতর আদর্শ কি? অসীমকে সসীম ভাবে উপাসনা করা। সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা—"নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্" সেই একেকে পৃথক্ ভাবে—বহু রূপে অর্চ্চনা করা সেই নিকৃষ্ট জ্ঞানের কার্য্য।

আমরা মনে করি যা দেখছি শুনছি—যা ধরতে ছুঁতে পারি তাই সত্য কিন্তু সাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা অন্যরূপ। গোড়ার কথা হচ্ছে—অদৃশ্য জগৎ—আধ্যাত্মিক জগৎ। সেই জগৎ আদি কারণ—মূল কারণ সেখান থেকে কার্য্যের উৎপত্তি। আগে অন্তরের ইচ্ছা পরে বাহিরের গতি।

র‍্যাফেলের চিত্র দেখিয়া আমরা বিমোহিত হই—তাজমহল প্রাসাদ দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করি। কালিদাসের কাব্যরসামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই। আমরা এই সকল কার্য্য দর্শন করি কিন্তু তার মূল কোথায়? মূল অধ্যাত্ম-জগতে। কাল্পনিক রাজ্য, সৌন্দর্য্যরসবোধ সে সবার আকর-স্থান।

এই যে দৃশ্যমান্ জগৎ এর মূল কারণ পরব্রহ্ম—তিনি অন্তরালে থাকিয়া রশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তাই এই জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে—তাঁর ইচ্ছাই মূলশক্তি। আমরা মোহবশতঃ দুর্ব্বলতা বশতঃ দেখিতে পাই না—আমাদের বিশ্বাসের বল নাই তাই সেই অতীন্দ্রিয় নিরাকার ঈশ্বর আমাদের জ্ঞাননেত্রে অপ্রকাশিত থাকেন।

যাঁহারা এই আদি সমাজের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা আমাদের সম্মুখে ঈশ্বরের সেই উচ্চ আদর্শ ধারণ করিতেছেন—হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সেই আদর্শ গ্রহণ কর। জীবনের পরীক্ষায় এই ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস কর—দেখিবে তোমাদের দৃষ্টান্তে কি সুফল প্রসব করিবে।

শুন মহর্ষি তাঁর আত্ম-জীবনীতে কি বলিতেছেন—

"আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদয় কামনা পরিতৃপ্ত হইল এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। আমি এতটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম, জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়মন্দিরের দেবতা হইলেন এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফল লাভ করিলাম। পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। আমি জানিতাম না যে, তাঁর এত করুণা। তাঁহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শতগুণ বাড়িল। এখন যতটুকু তাঁহাকে দেখিতে পাই, যতটুকু তাঁর কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। "যে ছেলে যত খায়, সে ছেলে তত লালায়।" হে নাথ তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আবার জাজ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দেও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য নবতররূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক। তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও। তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না। তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও। ইহা বলিতে বলিতে অরুণ কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃতদেহে, শূন্য হৃদয়ে, বিষাদ-অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেমবারির অভ্যুদয়ে হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, আমার চিরনিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবনস্রোত বেগে চলিল,

প্রাণ বল পাইল। আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেমপথের যাত্রী হইলাম, জানিলাম তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয় সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।”

২। ধর্ম্মবিষয়েও আমাদের দুই আদর্শ আছে—এক হীনতর আদর্শ, এক উচ্চতর আদর্শ। আমরা সাধারণতঃ হীনতর আদর্শই গ্রহণ করি, তাহা হইতেই আমাদের অধোগতি। হীনতর আদর্শ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম—হোম যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠান। কিন্তু ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস, কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহার চরিতার্থতা হয় না। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে হোম যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে এই কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দাবাদ করিয়া উপনিষদের ঋষিরা বলিলেন

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।

অষ্টাদশ কর্ম্মযুত এই সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম অদৃঢ়, অস্থায়ী—ইহারা কখনই শ্রেয় রূপে অভিনন্দনীয় নহে।

মনুষ্যের গন্তব্য পথ দুই, প্রেয় ও শ্রেয় —এক ভোগের পথ—অন্য যোগের পথ; এক আত্মসুখের পথ, অন্য কর্ত্তব্যসাধনের পথ। প্রেয়ের পথ সহজসেব্য, লোকেরা সেই পথে আকৃষ্ট হয়। শ্রেয়ের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় কঠিন; তথাপি সেই পথে না গেলেই নয়—সেই আমাদের মুক্তির পথ। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা যদি ইহকাল পরকালের কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে শ্রেয়ঃপথের পথিক হও। সেই পথে চলিতে গেলে তোমাদের সঙ্গে যে পাথেয় চাই তাহা আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা; দয়া, নিন্দা প্রশংসা নিরপেক্ষ হইয়া ন্যায় রক্ষা—ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ, আত্মাভিমান বর্জ্জন, শত্রুর প্রতিও ক্ষমা বিতরণ, যে তোমার অনিষ্টাচরণ করে তাহারও মঙ্গলকামনা করা, অসীম করুণা—বিশ্বব্যাপী মৈত্রীভাব যাহা বুদ্ধদেব প্রচার করিয়া বেড়াইতেন—প্রেম যাহা সেই প্রীতির প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টিকে অভিষিক্ত করে;—যে প্রেমের নিকট জাতিবিচার নাই—মানুষে মানুষে পার্থক্য নাই—একতা সমতা স্বাধীনতা যাহার মূলমন্ত্র—যাহা ঘরে ঘরে বিতরণ করিবার জন্য চৈতন্যদেব মর্ত্ত্যভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

হায়! আমরা দুর্ব্বল, সেই অনন্ত প্রেমকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না; আমরা সেই উচ্চ ধর্ম্ম-মঞ্চে আরোহণ করিতে পারি নাই, যেখান হইতে মনুষ্য মাত্রকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দিতে পারি—আমরা আত্মাভিমানেই গর্ব্বিত, আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত, ব্যবসায়ীর মত কেবল লাভ-লোকসানের দিকেই দৃষ্টি করি। সে ঔদার্য্য, সে সৌহার্দ্দ্য, সে মমতা সহৃদয়তা আমাদের নাই। মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরে আমাদের বিশ্বাস নাই—ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই—আমরা অন্তরে অন্তরে পাপ-চিন্তা মলিনতা পোষণ করিতেছি—তাই আমাদের চিত্ত অশান্তির আলয়—তাই আমাদের অধোগতি—

হে পরমাত্মন্, আমাদের গতি কি হইবে?

বল দাও মোরে বল দাও
প্রাণে দাও মোর শকতি,

সকল হৃদয় লুটায়ে
তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে,
খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে
চিত্তের চিরবসতি।
তব কাজ শিরে বহিতে,
সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে
নীরবে করিতে ভকতি।
তোমার বিশ্ব ছবিতে
তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশি রবিতে
হেরিতে তোমার আরতি।
বচন মনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নানা কথা।

সমাধি।—মৃতদেহ ভস্মসাৎ করা হিন্দু জাতির সনাতন পদ্ধতি। নানা কারণে উহার উপকারিতা সন্দর্শনে ইউরোপের অনেক জাতি সমাধির পরিবর্ত্তে প্রাগুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। জর্ম্মান দেশের ১৯০৭ সালের Cremation Societyর বাৎসরিক বিবরণে প্রকাশ যে ঐ দেশে ঐ বৎসর তিন হাজার মৃত দেহ ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। ১৯০৬ সালের যতগুলি মৃতদেহ ভস্মসাৎ করা হয়, তাহা অপেক্ষা পরবর্ত্তী বৎসরে ভস্মসাত্তেরসংখ্যা শতকরা ৪৫ জন বাড়িয়াছে। বলা বাহুল্য খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের আপত্তি সত্ত্বেও ভস্মসাৎ প্রথা ক্রমিকই তদ্দেশে বদ্ধমূল হইতেছে।

রাজনৈতিক। এ বৎসর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন পাবনায় হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা ভাবের মৌলিকতায় ও ভাষার বিশেষত্বে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নিজ ঐকান্তিকতায় বিভিন্ন দলের ভিতরে ঐক্যস্থাপনে অনেকদূর কৃতকার্য্য হন। বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতাদান: রাজনৈতিক এরূপ বিরাট ব্যাপারে নূতন কাণ্ড বলিতে হইবে।

সামাজিক। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বরস্বতী তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে নিজ বালবিধবা কন্যার শুভবিবাহ বিগত ১২ই ফাল্গুন সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে অনেক সভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মতে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হয়।

আনুগত্য। পাবনা প্রাদেশিক সমিতির অন্যতম নেতা খ্যাতনামা বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতার একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন "In Justice, Justice above every thing else, our loylty had it growth" আমাদের রাজভক্তির উৎস কোথায়—না সর্ব্বোপরি রাজার ন্যায় বিচারে। ধর্ম্মরাজ্যেও এই উক্তির বিশেষ সর্থকতা আছে। ঈশ্বরকে যদি আমরা ন্যায়বান রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি কিছুতেই তাঁহার দিকে প্রধাবিত হইতে পারিত না। তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে—তাঁহার অক্ষয় ন্যায়ের প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস, তাই তাঁহার উপর আমাদের অবিচলিত নির্ভর। ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্যের মূলে তাঁহার অক্ষয় ন্যায় সম্বন্ধে আমাদের স্থিরবিশ্বাস সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই জাগিতেছে।

বিলাতে মাঘোৎসব। ১লা ফেব্রুয়ারির খৃষ্টিয়ান লাইফ (Christian life)নামক পত্রে প্রকাশ যে লণ্ডন Essex Hall এসেক্স হলে—ব্রাহ্মসমাজের ৭৮ তম সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ৬০ জন ভারতবাসীও কয়েকজন অনুরাগী সাহেব মিলিত হন। কয়েকটি ভারতীয় মহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাসহ সুন্দর হিন্দু-পরিচ্ছদে আসিয়া সভাতলকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ডাক্তার ঘোষ ১২ই মাঘ রবিবার বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন। ১১ই মাঘ বৈকালে Rev George Critchley B. A. উপাসনা কার্য্য করেন। সকলধর্ম্মের মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। তিনি হাফেজের কথায় বলেন "সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক ; প্রতি মনুষ্যই তাহার প্রিয়তমকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে ; এই পৃথিবীই সেই প্রেমের মন্দির ; তবে কেন আর মসজিদ ও গির্জ্জা লইয়া অকারণ তর্ক বিতর্ক করিতেছ।" উহার পরে ডাক্তার ঘোষের সভাপতিত্বে Rev John Page Hopps ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উহার পরে দুই একজন মহিলার ক্ষুদ্র বক্তৃতান্তে বাঙ্গালা সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সম্পাদক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশকল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৩০ শক।

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৫। সম্বৎ ১৯৬৫। কলিগতাব্দ ৫০০৯। ১ চৈত্র, রবিবার।

মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র /০

অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প

দ্বিতীয়ভাগ।

বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯।

৭৭৭ সংখ্যা ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

যোগতত্ত্ব।

আত্মশক্তি ও দৈবশক্তি, এই দুই শক্তি আমাদের জীবন-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে আত্মশক্তিই সর্ব্বে-সর্ব্বা, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে আমাদের জীবনে দৈবের কি বিচিত্র গতি, কি প্রভূত প্রতাপ! প্রথমতঃ আমরা কতকগুলি পৈতৃক সংস্কার লইয়া, শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিসহ জন্মগ্রহণ করি। অতঃপর আমরা যেরূপ অবস্থায় লালিত পালিত হই, যে পরিবার ও সমাজে থাকিয়া শিক্ষালাভ করি তাহার কতদূর প্রভাব। আবার দেখুন এক একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনা আসিয়া কতসময় আমাদের জীবনস্রোতকে নূতন পথে সঞ্চালিত করে। আমার আত্মজীবনী হইতে একথা সপ্রমাণ হইতেছে। আমি বাল্যকালে একভাবে শিক্ষিত হইতেছিলাম, আমার জীবন প্রবাহ একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হইতেছিল, অকস্মাৎ এক সামান্য ঘটনাসূত্রে তৎসমস্ত বিবর্ত্তিত হইল; দৈব ঘটনায় কোন এক বন্ধুমিলনে সমস্তই উল্টাইয়া গেল। সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশ যাত্রা, এদেশের সিবিল সর্ব্বিসের জন্য ইংলণ্ডে পরীক্ষা দেওয়া, ইত্যাদি কারণে আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমার জীবনের ইতিহাস যে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে রচিত হইল তাহার কারণ এই অপ্রত্যাশিত মিত্রলাভ।

এই দৈবশক্তি যদিও বলবত্তর, তথাপি আমাদের জীবনে আত্মশক্তির প্রসার যথেষ্ট আছে। আমার প্রবৃত্তি সকল যতই প্রবল হউক, আমি যতই বিঘ্ন বিপত্তিতে পরিবৃত হই না কেন, আমি বুঝিতে পারি যে আমার কর্ত্তৃত্বশক্তি অখণ্ডনীয়। নানা প্রতিকূল অবস্থা, প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিয়া সে শক্তি কার্য্য করিতেছে। আমার নিজের ভালমন্দ বিষয়ে আমি নিজেই দায়ী, আমি আপনিই আপনার রক্ষক, আপনি আপনার সহায়। আমি ভাগ্যের অধীন নহি, ভাগ্য আমার কর্ত্তৃত্বাধীন।

গীতার একটি বচন আছে তাহা চিন্তাশীল মনুষ্য মাত্রেরই প্রণিধান যোগ্য। বচনটি এইঃ—

> উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
> আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

আপনাকে আপনি উদ্ধার করিবে আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মশত্রু।

দৈবের দাসত্ব করা কাপুরুষের লক্ষণ। দৈবের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া আত্মশক্তি-দ্বারা জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করাতেই পুরুষত্ব। তাই কথিত হইয়াছে

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা

দৈবকে হনন করিয়া আত্মশক্তি দ্বারা পুরুষকার অর্জ্জন করিবেক।

বুদ্ধদেবেরও ঐ উপদেশ। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের কিছুপূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দ বিমর্ষভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন এখন আমাদের সঙ্ঘের কি দশা হইবে? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ, আপনারাই আপনার নির্ভর স্থান। পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।"

এই সঙ্কটপূর্ণ ভবার্ণবে আত্মশক্তিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। কি শরীর রক্ষা, কি মানসিক কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, মনুষ্যের আত্মশক্তির প্রভাব পদে পদে অনুভূত হয়।

এই আত্মশক্তির বীজমন্ত্র হচ্ছে সংযম, সংযমেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি সংযমের নিয়ম রক্ষা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিই শুদ্ধাচারী, যিনি সংযমের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক যথেচ্ছ বিচরণ করেন তিনি স্বেচ্ছাচারী।

মনুষ্য কতকগুলি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। বিধাতা মঙ্গল উদ্দেশেই সেই সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়া আমাদের মনোরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই সকল প্রবৃত্তিকে সৎপথে নিয়োগ করাতেই আমাদের মঙ্গল—বিপরীত পথে চলিতে দিলেই অনিষ্ট। ক্রোধ অনেক সময় কার্য্য করী হয়, অন্যায় অত্যাচারের প্রতি ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক, তাহা বলিয়া যদি আমরা ক্রোধাবেশে আত্মহারা হইয়া অকারণে পরের উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহা নিন্দনীয়। আমাদের প্রতিজনের জীবনে কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা আত্মাভিমান—এইরূপ কোন না কোন প্রবৃত্তি একাধিপত্য করিতে চায় তাহাকে স্বেচ্ছামত চলিতে দিলে আমাদের সমূহ বিপদ—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি

মন যদি ছুটি চলে
ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান
বায়ু যথা তরণী ডুবায়।

এই সকল প্রবৃত্তিকে দমন করাতেই মনুষ্যত্ব—ইহাদের বশীকরণ মন্ত্রের নাম সংযম।

ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং।

এই সকল নানা বিষয়ে ধাবমান্ ইন্দ্রিয়গণের সংযমে যত্ন করিবেক, যেমন সুনিপুণ সারথী দুষ্ট অশ্ব সকলকে বশীভূত করে।

প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে আনা যে অত্যাবশ্যক তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে প্রবৃত্তি সকল অন্ধ, বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারা উত্তেজিত হয়। তাহারা আপনাকে আপনারা নিয়মিত করিতে পারে না। তাহাদের উপরে একজন নিয়ামক চাই। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে যাহা স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর তাহাতেই সকলসময় আমাদের রুচি হয় না, লোভে পড়িয়া অভোজ্য ভোজনে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে। যাহার অর্জনস্পৃহা

বলবতী, তাহার ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তেতেই মনস্তুষ্টি হয় না, যেন তেন প্রকারেণ অর্থলাভ হইলেই হইল। যে অর্থপিশাচ সে ধর্ম্মের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনে পশ্চাৎপদ হয় না। আমরা দেখিতে পাই অনেক সময় বাসনার দৌড় সেই দিকে যায়, যাহাতে স্বাস্থ্যনাশ মনস্তাপ জনসমাজের অকল্যাণ প্রসূত হয়।

আর একটি কথা। চরিতার্থতায় প্রবৃত্তি শান্ত হয় না, প্রত্যুত বিবৃদ্ধ হয়। যত পাই আরো চাই, প্রবৃত্তির গতি এই। যে লক্ষপতি সে ক্রোড়পতি না হইলে সন্তুষ্ট হয় না। ইহা হইতেই দেখা যায় 'অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ' পিপাসার অন্ত নাই, এ অতি যথার্থ কথা। আমরা মনে করি এবার এ সাধটা মেটানো যাক্, পরের বারে নিবৃত্তি-মার্গ অনুসরণ করা যাইবে। আমরা ভাবি না—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে।

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতভুক্ত অগ্নির ন্যায় আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

সসাগরা ধরণী ধনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, তবুও তাহার ধনলালসার নিবৃত্তি হয় না। রাজ্যেশ্বর যতই প্রভুত্ব বিস্তার করুক, কিছুতেই তার আশ মিটে না। যে যত লোকের প্রভু, সে চায় আরো সহস্র সহস্র লোক তাহার পদানত হয়। ইহা হইতেই প্রতীতি হইবে যে প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে আনিয়া সংযত করাই আমাদের স্বাস্থ্য শান্তি ও মঙ্গলের প্রকৃষ্ট পন্থা।

যখন প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা একই পথে যায় তখন সকলি সরল, সকলি সুগম, সকলি সুশৃঙ্খল। কিন্তু এ পৃথিবীতে তাহা সকল সময়ে হইয়া উঠে না।

কতবার এরূপ ঘটে যে প্রবৃত্তি এক-দিকে টানিতেছে, কর্ত্তব্য বুদ্ধি অন্যদিকে; বাসনা ও ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যে বিরোধ, স্বার্থ পরার্থে বিরোধ আসিয়া পড়ে। এই উভয় সঙ্কটে সংযমীই বিবেকের বাণীতে পরিচালিত হন। যিনি স্বেচ্ছাচার ছাড়িয়া কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হয়েন, যিনি পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন; যিনি অশেষ বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচলিত থাকেন, তিনিই সংযতাত্মা সাধু পুরুষ। এই সকল সাধু পুরুষদিগের আচরণই আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল।

আত্মসংযমের অভাবে আমাদের পদে পদে বিপত্তি, পদে পদে দুর্গতি ঘটে। এই হেতু বাল্যকাল হইতে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সংযমশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়, সংযমশিক্ষার প্রতি সেইরূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, কেন না চরিত্র-গঠনের প্রধান উপকরণ—সংযম। আমাদের শাস্ত্রে ব্রত উপবাসাদি অনুশাসনের উদ্দেশ্য ঐ। পানাহারের অত্যাচারে আমাদের যে স্বাস্থ্যনাশ, শরীরক্ষয় হয়, তাহার গোড়ার কথা সংযমের অভাব। বিদ্যার্থী যে বিদ্যাভ্যাসের সময় ক্রীড়ামোদে মত্ত থাকিয়া বিদ্যার বদলে অনাচারে পাণ্ডিত্য লাভ করে, তাহার কারণ সংযমের অভাব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখুন সে দিন সুরাট নগরে কি শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইল! আমাদের পূজ্যতম নেতাগণের অবমাননা, বিবাদ-কলহ মারামারির স্রোতে আমাদের রাষ্ট্রীয় মহাসভার মূলোচ্ছেদ, এ কি সামান্য লজ্জার বিষয়? ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? এই যে আমরা সাধারণ হিতের জন্য আপনাকে ভুলিতে শিখি নাই। আমরা যে স্বদেশী

স্বদেশী করি, তাহা মৌখিক ভাণমাত্র, আমাদের আত্মত্যাগ নাই, আত্মসম্বরণ নাই, এক কথায় আত্মসংযমের অভাব। আমরা স্বরাজ্য স্থাপনের জন্য ব্যাকুল, অথচ আপনাদের এই ক্ষুদ্র নৌকাখানি চালাইতেও অক্ষম।

এই প্রসঙ্গে আমি যোগ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিয়া শেষ করিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষে যোগ বলিয়া একটি জিনিস আছে যাহা অন্য দেশে দেখা যায় না। কিন্তু হায়! এইক্ষণে এই যোগরহস্য এ দেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কেবল কতকগুলি সন্ন্যাসীর মধ্যেই বদ্ধ এইরূপ শুনা যায়। এই যোগ কি? সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে সংযমের উচ্চাঙ্গ সাধনের নাম যোগ। সংযম নিম্নস্তরে, যোগ তাহার উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠিত। যিনি অসংযতাত্মা তাঁহার পক্ষে যোগসাধন অসম্ভব। যোগপ্রণালী আত্মজীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এরূপ লোক বিরল। তবে যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করাই আমার অভিপ্রায়।

যোগ পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়। পাতঞ্জল মতে, যোগের অর্থ চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

এই যোগ অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

যম—অহিংসা, সত্য ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান।

আসন—পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন বন্ধন।

প্রাণায়াম—প্রাণবায়ুর সংযমন।

প্রত্যাহার—বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রতিনিবৃত্তি।

ধারণা—বিষয় বিশেষে চিত্তের অভিনিবেশ।

ধ্যান—চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহ।

সমাধি—ধ্যানের উন্নতাবস্থা, যে অবস্থায় ধ্যান ও ধ্যেয় বিষয় একীভূত হয়। সমাধির উচ্চতর অবস্থাকে নির্বীজ সমাধি বলে। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হইলে নির্বীজ সমাধি লাভ হয়।

এই যোগের ফল কি?

পাতঞ্জল মতে যোগ সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। সেই পুরুষকে তখন শুদ্ধ বুদ্ধ বলে। ইহারই নাম কৈবল্য সিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

ভগবদ্গীতাও যোগশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগতত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিয়া অর্জ্জুনকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। গীতায় যোগকাণ্ড আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে পাতঞ্জলদর্শনের সহিত যেমন তাহার কতক বিষয়ে মতের ঐক্য আছে তেমনি অনেক বিষয়ে অনৈক্যও আছে। গীতা পাতঞ্জল প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গযোগ সাধারণতঃ অনুমোদন করিতেছেন, কিন্তু উহার মত তিনি সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর-প্রণিধান পাতঞ্জল যোগের অন্যান্য সাধনের মধ্যে একটি সাধন মাত্র। কিন্তু গীতার নিজস্ব যোগ পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ। জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হওয়াই গীতোপদিষ্ট অধ্যাত্মযোগ। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোন বাধা হয় না, কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্ত সংযোগই প্রকৃত যোগ—ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারে অসম্ভব। সাধন দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধে কৃতকার্য্য

হইলাম, কিন্তু ভজন দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমামৃতরস পান করিতে পারিলাম না, তবে সে সাধনের ফল কি? চিত্তবৃত্তি বশীভূত করাই বা কি জন্য? চিত্তবৃত্তি নিরোধ গীতার চরম লক্ষ্য নহে, উপায় মাত্র। গীতার লক্ষ্য ব্রহ্মনির্ব্বাণ—ব্রহ্মের সহিত সম্মিলন। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন। ভগবান্ বলিতেছেন—যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভীক, ব্রহ্মচারী, সংযতমনা হইয়া আমাতেই চিত্তার্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবেক।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

ঈশ্বরে চিত্ত নিহিত করাই যোগীর প্রতি গীতার মুখ্য উপদেশ।

যোগের চরম ফল সম্বন্ধেও পাতঞ্জল ও গীতার ভিন্ন মত। পাতঞ্জল মতে যোগীর চরম অবস্থা সুখ, দুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। এ অবস্থা অভাবাত্মক, দুঃখের অভাব মাত্র। গীতায় যোগের ফল যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ভাবাত্মক—সুখের পূর্ণমাত্রা—অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।
যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে,
যারগুণে গুরু দুঃখ তুচ্ছ হয় মনে।

এই সুখ ক্রমে ঘণীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। গীতোক্ত যোগ-সাধনের ফলে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়েন।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।
বিরজ, বিগত পাপ, প্রশান্ত হৃদয়,
নিত্য শান্তি লভে যোগী হয়ে ব্রহ্মময়,
এ হেন সাধনাগুণে হয়ে পাপহীন
ব্রহ্মপরশন-সুখ ভুঞ্জে অনুদিন।

আমাদের মধ্যে এক সাধারণ সংস্কার এই যে উপবাসাদি উপায়ে শরীরকে যত পীড়ন করা যায়, যোগের পথ ততই সুগম হয়। কিন্তু গীতার মত তাহা নহে। যাহারা ঈদৃশ কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া শরীরের প্রতি অত্যাচার করে, গীতার চক্ষে তাহারা আসুরিক প্রকৃতির লোক। সপ্তদশ অধ্যায়ে এইরূপ তপস্যা তামসিক বলিয়া বর্ণিত,—যথা,

দম্ভ অহঙ্কারে স্ফীত, কামরাগ উদ্দীপিত,
অশাস্ত্র বিহিত ঘোর তপঃ পরায়ণ,
অনশন ব্রতাচারে, শরীর শোষণ করে,
অন্তরস্থ আমাকেও করে নির্য্যাতন;
এই ঘোর তপস্যায়, যাদের জীবন যায়,
ইহাতেই নিরত যাহারা, ধনঞ্জয়,
সহে ক্লেশ অকারণ, মূঢ়মতি অচেতন,
জেন তারা ক্রূরকর্ম্মা অসুর নিশ্চয়।

গীতোক্ত যোগপ্রণালী অন্যতর। অতিভোজনে বা ঐকান্তিক উপোষণে যোগ হয় না, অতিনিদ্রা বা ঐকান্তিক জাগরণে যোগসিদ্ধি হয় না। যুক্তাহার বিহার, যুক্ত নিদ্রা জাগরণ, যুক্ত কর্ম্মচেষ্টা, এই সমস্ত উপায়ে দুঃখনাশন যোগ সিদ্ধি হয়।

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তনিদ্রাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

গীতা এই যে যোগাভ্যাসের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহা কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। একদিকে অপর্য্যাপ্ত পানভোজন বিষয়ামোদে মত্ততা, অন্যদিকে ব্রত উপবাসাদি কঠোর নিয়মে শরীর-শোষণ, গীতা এই উভয় প্রান্তের মধ্যপথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিতেছেন, যে পথ বুদ্ধদেব তাঁহার চতুর্মহাসত্যের সর্ব্বপ্রথম উপদেশে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কর্ম্মযোগ ছাড়িয়া যে সন্ন্যাস অর্থাৎ

সংসারত্যাগরূপ যে সন্ন্যাস তাহা গীতার অনুমোদিত নহে। গীতা বলেন এরূপ সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যিনি ফলকামনা-শূন্য হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী ; যিনি নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ যিনি অগ্নিসাধ্য ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী ও নন, যোগী ও নহেন। গীতার যিনি আদর্শ যোগী, তিনি কর্ম্ম করিয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় কর্ম্মেতে নির্লিপ্ত, সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক সুখদুঃখে অবিচলিত, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সর্ব্বভূতহিতে রত, জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ক্রিয়াবান্। —গীতা বলিতেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ
ইহৈব তৈ র্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ
বাহ্য স্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্
সব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি
লভন্তেব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ
ছিন্নদ্বৈধাযতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ
কাম ক্রোধ বিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।

ব্রাহ্মণ বিনয়ী যতী, চণ্ডাল ঘৃণিত অতি,
　　গাভীকরী কুকুরে সমান,
সমদর্শী সর্ব্বঠাঁই, ভেদাভেদ কিছু নাই,
　　দেখিছেন সব এক প্রাণ।
হেন সাম্যময় চিতে, জেন, পার্থ, সর্ব্বরীতে,
　　এখানেই হয় স্বর্গজিত ;
নিষ্পাপ পুণ্যনিধান, ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র সমান,
　　ব্রহ্মভাবে হন অবস্থিত।
প্রিয়লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্লিষ্ট,
　　দুঃখে নাহি হন উদ্বেজিত,
নির্ম্মোহ নিশ্চল মতি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেতে রতি,
　　ব্রহ্মে তিনি হন অবস্থিত।
ইন্দ্রিয় বিষয় রাগে, বিরাগ সতত জাগে,
　　আপনায় সদানন্দময়,
ব্রহ্মযোগে হয়ে যুক্ত, সংসার বন্ধনমুক্ত,
　　ভুঞ্জে চির আনন্দ অক্ষয়।
আত্মায় যাঁহার মতি, আত্মায় যাঁহার রতি,
　　অন্তর্জ্যোতি সদা দীপ্যমান,
সর্ব্বভূতহিতে রত, দ্বিধাহীন শুচিব্রত,
　　আত্মতত্ত্ববিৎ পুণ্যবান,
কামক্রোধ বিরহিত, সন্ন্যাসী সংযতচিত,
　　বিষয়বাসনা অবসান,
জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মে হন অবস্থিত,
　　লাভ হয় ব্রহ্ম নির্ব্বাণ!
　　　ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরের ভাব।

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে ঋষিদিগের নবীন নেত্রে প্রকৃতির নবীন সৌন্দর্য্য, বজ্র বিদ্যুতের অদম্য প্রতাপ, অগ্নি সূর্য্যের জ্বলন্ত তেজ, মেঘ মৃত্যুর অজেয় শক্তি সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত, উঁহাদের বন্দনা গাথায়—উঁহাদের তৃপ্তি সাধনে বৈদিক ঋষিরা নিজ নিজ চেষ্টা ও সামর্থ্য বিনিয়োগ করিতেন, এ কথা সত্য হইলেও এ ভাব—এ মোহ তাঁহাদিগকে ব্যাপককাল ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি তাঁহাদিগকে প্রথমে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের সতেজ বুদ্ধি ও চিন্তাকে এককালে আচ্ছন্ন বা অসাড় করিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাঁহারা অগ্নিতে হব্যকব্য দিতেন, সূর্য্যের স্তুতি বন্দনা করিতেন, মৃত্যুকে বজ্রকে ইন্দ্রকে বরুণকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য লালায়িত হইতেন, কখন বা বহু ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, কিন্তু এই সকল ভাবের ভিতর হইতে এক ঈশ্বরের

সম্বন্ধে বিশ্বাস ও নির্ভর ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। প্রকৃতির মোহিনী শক্তি তাঁহাদের হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সে উন্নত ভাবকে আর চাপা দিয়া রাখিতে পারিল না। তখন তাঁহারা সরল ও সহজ বাণীতে বলিয়া উঠিলেন

ভয়াৎ অস্য অগ্নি স্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যু ধাবতি পঞ্চমঃ।

তাঁহারা একের সন্ধানে পাইলেন, তাঁহার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন, তাই তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দিলেন "অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু ইহাদের আর দেবতা বলিব না—ঈশ্বর বলিব না, ইহারা একেরই শাসনে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত—আমরা এক্ষণে তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি। ঋষিদিগের চিন্তা—ঋষিদিগের সাধনা এক ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়া স্থির থাকিতে পারিল না; তাঁহার সঙ্গে নিজেদের যে কি মধুময় যোগ, তাহা তাঁহারা ধারণায় আনিয়া ফেলিলেন এবং ইহাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন যে

"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। (ব্রাহ্মধর্ম্ম ৮ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)।

তাঁহাকে হৃদয়ে আত্মার ভিতরে সন্দর্শন করিতে হইবে। সংসারে যদি প্রকৃত শান্তি থাকে তবে তাঁহাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করিয়া। আত্মার ভিতরে পরমাত্মাকে সন্দর্শন—আধ্যাত্মযোগের এই যে সন্ধান, আর্য্যঋষিগণ শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা সাধনা প্রভাবে বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধির এই যে প্রাখর্য্য, সাধনার এই যে তীব্রতা, তাহা সমস্ত জগৎকে এখনও স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। বলিতে গেলে সমগ্র জগতের সমস্ত সভ্যজাতির ধর্ম্মপিপাসুগণ ঐ লক্ষ্য ধরিয়া ঐ রূপ সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। অধ্যাত্মযোগের এই যে অভ্রান্ত বাণী, উহা যেরূপ সুনিপুণ ভাষায় পরিস্ফুট ভাবে উপনিষদের প্রতি পত্রে অঙ্কিত, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্ম আজও তাহা সে ভাবে চিত্রিত করিতে পারে নাই, সে উচ্চতা সে গাম্ভীর্য্য দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। আমরা ঋষিদিগের যে অমূল্য সম্পত্তিতে-আধ্যাত্মিক ধনে গৌরবান্বিত, বর্ত্তমানে তাহার জন্য শূন্য গর্ব্ব শূন্য অভিমান করিলে চলিবে না; আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিবার চেষ্টা আমাদিগের প্রত্যেককেই পাইতে হইবে। এই সাধনাতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত দেবত্ব লাভ হইবে।

বৈদিক সময়ে প্রকৃতির শক্তি নিচয় ও এক ঈশ্বর লইয়া গবেষণা। পরিশেষে এক ঈশ্বরের সিংহাসন সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু পৌরাণিক যুগে আর এক বিচিত্র ভাব। অবতারবাদ পৌরাণিক সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এদেশে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এই জ্ঞানোন্নত সময়েও অনেকে অবতারবাদের অনুকূলে বিশেষ যোগ্যতার সহিত লেখনী পরিচালন করিতেছেন। অবতারবাদ এমনই আমাদের অস্থি-মজ্জার সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে তাহা স্বাধীন চিন্তাকে বিকশিত হইতে দেয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবতারবাদ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের কণামাত্র লইয়া মহানুভব কর্ম্মীগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া কখন বা ধর্ম্মে সংস্কার কখন বা সাধনে ঐকান্তিকতা সতেজে অন্তর্নির্ব্বিষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হয়েন, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে জীবনে দেশকে মাতাইয়া তোলেন, সমগ্র জনসমাজকে উন্নতির দিকে এক পদ অগ্রসর করিয়া দেন,

চিন্তাকে নূতন পথে—প্রকৃত কল্যাণের অভিমুখীন করিয়া দিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের অতুল্য প্রভাব অতুল্য শক্তি তোমার আমার অপেক্ষা অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের স্থান অর্পণ করিতে বা ভগবান বলিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিরতিশয় কৃতজ্ঞতার সামগ্রী, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নররূপী ঈশ্বর নহেন। আমাদের যিনি ঈশ্বর, তিনি তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিতে পারেন না, তিনি তাঁহার অনন্ত পরিধিকে সার্দ্ধ ত্রি হস্তের ভিতরে আনিতে পারেন না; তাঁহার স্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান এ কথা প্রতি অক্ষরে সত্য; কিন্তু ইহাও তেমনি সত্য, যে তিনি অনন্ত, তিনি কোন অবস্থায় সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত নহেন। অসংখ্য তারকাখচিতনীলাকাশসমন্বিত সমুদয় বিশ্বে যিনি সমানভাবে ওতপ্রোতরূপে বিরাজমান, তিনি আপনার অসীম বিশালসত্তা গুটাইয়া, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ হইতে আপনার সত্তা প্রত্যাহার করিয়া, আপনার পূর্ণ মহিমাতে সসীম নররূপে, সমগ্র বিশ্বের তুলনায় ধুলি পরিমাণ আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ভিতরে তোমার আমার মত পাপীর সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে! ভগবৎ দর্শন কিএতই সহজ। এই কি পরব্রহ্মের লক্ষণ। ইতিহাস কি ঈশ্বরের এইরূপ পূর্ণঅবতারত্ব গ্রহণের সাক্ষী দেয়। পূর্ণ অবতারের অবতরণ কি কেবল অনৈতিহাসিক যুগেই ঘটিয়াছিল। ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে ভাগবতের কথাই প্রকৃত সত্য যে "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" অবতারের সংখ্যা নাই। সরোবর পূর্ণ হইয়া গেলে যেমন তাহার উচ্ছ্বসিত বারিরাশি বিভিন্ন সংকীর্ণ ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী ধরিয়া বাহির হয়, তেমনি অনন্তমঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে তাঁহার কল্যাণ ও মঙ্গলের বার্ত্তা বহন করিয়া জগতে শান্তি বিস্তারের জন্য অসামান্য ক্ষমতাপন্ন মানবের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন বলিতে চাও, বলিতে পার; কিন্তু পূর্ণ অবতার বা পরব্রহ্ম বলিও না। ভগবতের কথায় তাঁহারা ঈশ্বরের অংশ বা কলা মাত্র। ঈশ্বরের কণামাত্র মঙ্গলভাব তোমার আমার মধ্যেত আছেই। কিন্তু স্ফূর্ত্তি না পাইয়া তাহা মলিন ও নিষ্প্রভ। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের বাণী শুনাইবার জন্য জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সে ভাব হীরকদ্যুতিতে স্ফূর্ত্তি পায়, জগৎ তাহা দেখিয়া স্তব্ধ-পুলকে বিমোহিত হইয়া পড়ে।

আমাদের এ কি মোহ, যে ক্ষুদ্র আমরা ঈশ্বরের মহান ভাবকে খর্ব্ব করিতে চাই। ইহা দেখিয়া জনৈক অনুতাপীর মর্ম্ম কথা এই,

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা খিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো তত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তৎ বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।

হে ঈশ্বর! রূপ বিবর্জ্জিত তুমি, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা তোমার রূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; তুমি নিজে অনির্ব্বচনীয়, আমি কিন্তু স্তব করিতে গিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছি; সর্ব্বব্যাপক তুমি, অথচ তীর্থযাত্রাদ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্ব যে বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি; হে ভগবন! আমার অজ্ঞনতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।